রাঢ়ের পূর্বপুরুষ পূজা

গ্রামদেবদেবী □ লোকধর্ম □ লোকসংস্কৃতি

ড. মিহির চৌধুরী কামিল্যা

অধ্যাপক □ বাংলা বিভাগ □ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়



ভোলানাথ প্রকাশনী

৮/১১, বেনিয়াটোলা লেন• কলিকাতা-৯

□ প্রথম প্রকাশ
বুদ্ধপূর্ণিমা ১৩৯৮ □ রোহিণ উৎসব □ ২৮ মে ১৯৯১
□ প্রকাশক
মঞ্জু দাশ □ পি ৭২৯ লেকটাউন □ কলিকাতা-৭০০০৮৯
□ মুদ্রক
দীপালী নাহারায় □
বাবা তারকনাথ প্রেস □ ১৪ নরেন সেন স্কোয়ার □ কলিকাতা-৭০০০০৯
□ প্রচ্ছদ
গোপাল মণ্ডল □ বাংলা বিভাগীয় ছাত্র □ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
□ অলংকরণ
শ্রীবিন্দুভূষণ পা[illegible]

জাতি ধর্ম বর্ণ সম্প্রদায়
দল মত আস্তিক নাস্তিক নির্বিশেষে
কারণে অকারণে যাঁর কাছে ছুটে যান
সেই 'স্বতন্ত্র ঈশ্বর'

বালক ব্রহ্মচারীকে

রাঢ়ের পূর্বপুরুষ পুজা

লেখক কী বলছেন

'ইত যে-সে ঠাকুর লয় লয়। ই আমদের লোক। আমদের বুঢ়ার বড়-বাপের বড়-বাপ। উয়ার হা দমে কহানি। দমে জাহুরা। হুঁ বলতে তুঁ। শুনবেক'—গরব করে বললেন হাঁসাবুড়ি, বাঁকুড়ার দুবরাজপুর পল্লীর গ্রামঠাকুর মাঝি-বুড়ার পুজারী জানকী হাঁসদার ঠাকুমা। 'বয়েস চার পাঁচ কুড়ি'। শ্বশুর স্বামী পুত্র নাতি, চার পুরুষের পুজো দেখছেন নিজের চোখে। গর্ব করে বলেছেন, এ-ঠাকুর তাঁদের লোক ছিলেন। তিনি ছিলেন ওঁর স্বামীর প্রপিতা-মহর প্রপিতামহ। কিন্তু এ কী বলছেন বৃদ্ধা!

গ্রাম-দেবতার ওপর সমীক্ষা চালাচ্ছি সুদীর্ঘকাল। বৃহত্তর রাঢ়ের লোক-ভাষা, লোকধর্ম ও লোক-সংস্কৃতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছি মাধ্যমিকের যুগেই। কিন্তু কোথাও তো শুনিনি গ্রাম-ঠাকুর 'আমদের লোক'! স্ট্রাইক করলো। এদেবতা সম্পর্কে ওঁর কথা, পুজারীর কথা, গ্রামবৃদ্ধবৃদ্ধাদের কথা রেকর্ড করলুম। ছুটে এলুম প্রাচ্যবিদ্যার গঙ্গোত্রী পিতামহআচার্য ডঃ সুকুমার সেনের কাছে। বললেন, 'ঠিকই ধরেছো। এমনি অনেক গ্রাম-দেবদেবীর মূলে আছে মানুষ। অনুসন্ধান কর। সব লিখে আনো।' বললুম, 'কিন্তু প্রমাণ'? আচার্য বললেন, 'লোক-ঐতিহ্যই প্রমাণ। লোককাহিনীগুলি অবিকল লেখো। বুঝতে চেষ্টা করো'। বুঝলুম, সব গ্রামঠাকুরই কল্পিত নয়। কোনো কোনো কারণে মানুষও দেবতার মতো পুজো পেয়েছে। তারপর যেখানেই একাজে গিয়েছি, তন্ন তন্ন করে খুঁজতে চেষ্টা করেছি, তার মধ্যে মানুষ উঁকি ঝুঁকি মারছে কি না। বস্তুত এমনি একটি ভাবনা থেকেই এ গ্রন্থের জন্ম।

কিন্তু একটি মানুষ কেমন করে, কী পরিস্থিতিতে, কোনো এক বা একাধিক পরিবার বা গোষ্ঠী বা গ্রামের 'ঠাকুর' হয়ে উঠলেন, সেই তমসাচ্ছন্ন ইতিহাস আবিষ্কার সহজ কাজ নয়। প্রমাণের সম্পূর্ণ অসম্ভাব, তথ্যের সঙ্গত বিলুপ্তি, ও প্রাপ্ত উপকরণের এমন নিচ্ছিদ্র জট যে, হারিয়ে যাই ক্ষণে-ক্ষণেই। বস্তুত লোকঐতিহ্য, লোক-কাহিনী, প্রবাদ প্রবচন ও নৈবেদ্যের কিছু কিছু অবস্থান ছাড়া এক্ষেত্রে আমাদের এগোবার পথ নেই। বহু বছরের নিরলস কৃচ্ছ্রসাধনায় প্রাপ্ত সেই যৎসামান্য তথ্যকেই বিচার করেছি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্তের আলোকে। তবে সর্বদাই বিষয়টিকে আমি বুঝতে চেষ্টা করেছি আমার নিজের মতো করেই।

বৃহত্তর রাঢ়ের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা গ্রাম-দেবতাদের মধ্যে মাত্র ২২টিকে আমি পূর্বপুরুষ পুজোর প্রাচীন সাক্ষী বলে মনে করেছি। এছাড়াও বাঁকুড়ার ফুলকুসুমা গ্রামের 'কালামহাদন', রাইপুরের 'কঁকাঠাকুর' এবং হুগলীর আনুড়ের 'ময়নামতী' এবং নানাস্থানের বুড়াবুড়ি-অন্তিক কিছু গ্রামদেবদেবীর

পুজোর মূলে মানুষ পুজো সংগুপ্ত থাকতে পারে। কিন্তু সেই সব কিছু নিয়ে, বড় একটি গ্রন্থ প্রকাশ, এই আকাশছোঁয়া বাজারে প্রায় অসম্ভব। তার ওপর আছে লোকসংস্কৃতির সম্মান-লোভীদের বেপরোয়া 'টুকিতং' মারিতং, অক্ষম পণ্ডিতের ঈর্ষা ও ঈর্ষাজাত অবজ্ঞা।

তবু সৌভাগ্যের কথা না বলে পারিনা। ইতিমধ্যে (১৯৮৯ মার্চ) বেরিয়েছে আমার 'রাঢ়ের গ্রামদেবতা'। সেই গ্রন্থ কিংবা আমার 'বাঁকুড়ার উপভাষা' (১৯৭২) পাঠ করে সাদরে তথ্য গ্রহণ করে, আমার গবেষণাকে সমর্থন ও স্বীকৃতি দিয়েছেন আচার্য ডঃ সুকুমার সেন। তিনি এই বয়সে (৯১) এ গ্রন্থের 'উদ্বোধন' লিখে দিয়ে আমাকে গৌরবান্বিত করেছেন। বহুদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা নানা বিষয়ে তিনি আমাকে বিদ্যা দান করেছেন ঠিক প্রাচীন আর্যঋষির মতোই। তাঁর শ্রীচরণে আমার ভূমিষ্ঠ প্রণাম।

'গ্রামদেবতা' বা লোকভাষায় প্রবন্ধগুলি পড়ে আমার মতো এক গবেষককে স্বীকৃতি দিয়েছেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ পবিত্র সরকার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় প্রধান, অধ্যাপক ডঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ, পশ্চিমজার্মানীবাসী কবি-অধ্যাপক অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, খ্যাতকীর্তি সঙ্গীত-শিল্পী ডঃ ভূপেন হাজারিকা ও যশস্বী অধ্যাপক পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য প্রমুখ অনন্য মানুষেরা। এঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা অন্তহীন।

আমার সমস্ত সাহিত্যকর্মের উৎস আমার মা শান্তিবালা দেবী। তাঁকে আমি রাঢ়ের লৌকিক সংস্কৃতির প্রতিমূর্তি মনে করি। তাঁর মুখ থেকেই প্রাচীন রাঢ়ের ব্রতকথা-উপকথা, ফড়ই, ভাদুটুসুর গান, গ্রামীণ সংস্কার বিশ্বাস, কাঠিনাচ ভুয়াংনাচ ফরীখেলার বিবরণ ও বাঁকুড়ার গ্রামীণ শব্দ পেয়েছি ঠিক বাঁধভাঙা নদীর স্রোতের মতোই। আর সেই প্রেরণাকে প্রতিষ্ঠিত হতে সর্বতোমুখী সাহায্য করেছেন আমার গুরুমা অধ্যাপিকা ডঃ সুনন্দা দত্ত এবং আমার গবেষণা নির্দেশক অধ্যাপক ডঃ বিজিতকুমার দত্ত। এঁদের শ্রীচরণে আমার ভূমিষ্ঠ প্রণাম।

তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করেছেন নৃত্য-নাট্য-সংগীতের বিরল শিল্পী বাঁকুড়ার বাসুদেব চন্দ্র, বাঁকুড়া সংস্কৃতির জীয়ন্ত বাহক অধ্যাপক রামপ্রসাদ পাত্রকর্মকার, লোকসংস্কৃতির দুই গবেষক ডঃ গোপেন্দু মুখোপাধ্যায় ও রোহিনীনাথ মঙ্গল। কিছু পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছেন কবি জয়ন্ত সোম। উদ্দীপিত করেছেন আকাশবাণীর শোভন পাঠক, অগ্রজপ্রতিম বিনয় সরকার ও কবি কুশল দে। এঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

সম্পূর্ণ প্রুফ দেখেছে আমার স্ত্রী সবিতা চৌধুরী ও দুইপুত্র শ্রীমান সুমন্ত ও শ্রীমান সুদীপ্ত। তেমনি গ্রন্থপ্রকাশে যেন তাড়া করে ফিরেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলার সুব্রত চন্দ্র। কিন্তু এদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নিছক সৌজন্যের নয়॥

২৮.৫.১৯৯১ মিহির চৌধুরী কামিল্যা

রাঢ়ের পূর্বপুরুষ পূজা

পূর্বপুরুষ পুজোয় রাঢ়ের লৌকিক জীবন ও সংস্কৃতি

রাঢ়ভূমি □ দেশ ও মানুষ[১]

'অস্তি রাঢ়াভিধানো জনপদঃ। গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়াপুরী'—কৃষ্ণমিশ্র □ একাদশ শতক

১

'রাঢ়' কথাটির এখন চল্ নেই। একসময় ছিল। এখনকার মানচিত্রে তার নাম নেই। এক সময় ছিল। বেদে পুরাণে তার উল্লেখ নেই। কিন্তু তাদেরও আগে তার অস্তিত্ব ছিল। রাঢ় ছিল। রাঢ় আছে। রাঢ় থাকছে। মানুষের জীবন ও মন থেকে তা লোপ পাচ্ছেনা।

খ্রীষ্টের জন্ম হয়নি তখনো। তাঁর জন্মেরও অন্ততঃ ছ-শো বছর আগে, রাঢ় থাকার আছে পাথুরে প্রমাণ। তখনকার জৈন গ্রন্থ 'আচারাঙ্গ সুত্ত'। তাতেই বলা হয়েছিল, ২৪তম জৈন তীর্থংকর মহাবীর বর্ধমান রাঢ়দেশে ভ্রমণ করেছিলেন। রাঢ়বাসী তাঁর পেছনে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিলেন। সেই থেকে নানা সংস্কৃত সাহিত্যে রাঢ় নামের উল্লেখ। অসংখ্য লিপি শিলালিপি ও তাম্রলিপিতে রাঢ় শব্দের অবস্থান। দশম শতাব্দীতে, যখন বাংলা ভাষা সবে জন্ম নিচ্ছে, তখনই রাঢ়ের দুটো ভাগ ছিল 'উত্তর রাঢ়' ও 'দক্ষিণ রাঢ়' নামে। তখনকার শ্রীধর ভট্ট বলেছেন দক্ষিণ রাঢ়ের কথা। ভোজবর্মণের তাম্রলিপিতে মেলে উত্তর রাঢ়ের প্রসঙ্গ। একাদশ শতকের কবি কৃষ্ণমিশ্র গৌড়ের মধ্যে রাঢ়াপুরীর প্রশংসা করছেন।

বাংলা সাহিত্যে রাঢ়ের নাম পাই ষোড়শ শতাব্দী থেকেই। বৃন্দাবন দাস, লোচন দাস থেকে অষ্টদশ শতাব্দীর ভারতচন্দ্র নরহরি চক্রবর্তী পর্যন্ত সকল কবিই রাঢ়ের গৌরব কথা লিখেছেন। মুকুন্দ চক্রবর্তী রাঢ়ের 'চোয়াড় জাতি'র কথাও জানতে ভোলেননি কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতেই। সেই থেকে উনিশ শতকে মধুসূদন পর্যন্ত বলেছেন রাঢ়ের কথা।

কিন্তু কোন্ দেশটা রাঢ়? কি তার সীমানা? প্রাচীন মধ্যযুগের সংস্কৃত বা বাংলা সাহিত্যে তার উল্লেখ নেই। উল্লেখ থাকে না। পণ্ডিতেরা নানা ভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে সে-সীমানা নির্দেশ করেছেন। ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তো সারা পশ্চিমবঙ্গকেই রাঢ় বলতে চেয়েছেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার

১. ইতিপূর্বে 'রাঢ়ের গ্রামদেবতা' (১৯৮৯) গ্রন্থে রাঢ়, দেশ ও জাতি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। বর্তমান গ্রন্থে তাই নামমাত্র পরিচিতি দিলুম।

বলেছেন গঙ্গার দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলকে। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার বাদ দেননি কলকাতা ২৪-পরগণা এমনকি মুর্শিদাবাদও। আচার্য সুকুমার সেন অজয় ও দামোদর নদের উত্তরাংশকে বলেছেন 'উত্তর রাঢ়', দক্ষিণ পশ্চিম ও অপর দুপাশকে বলেছেন 'দক্ষিণ রাঢ়'। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, পূর্বে ভাগীরথী, উত্তরে ময়ূরাক্ষী, দক্ষিণে দামোদর ও পশ্চিমে ছোটনাগপুরের পার্বত্য ভূমিই হলো প্রাচীন রাঢ়ের সীমানা। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু এর সঙ্গে যোগ করতে চান হাওড়াকেও।

রাঢ় বলতে আমিও বুঝি গঙ্গা-ভাগীরথীর পশ্চিম দিকের বর্তমান জেলা গুলিকে। তবে যথার্থ রাঢ় হলো বর্ধমান বীরভুম বাঁকুড়া পুরুলিয়া মেদিনীপুর (পূর্বাংশ বাদে) ও হুগলী জেলা (পূর্বাংশ বাদে)। কিন্তু তার মধ্যেও বলবার আছে। এই বৃহৎ ভূখণ্ড রাঢ়কে আমি দুভাগে চিহ্নিত করতে চাই— 'পূর্ব রাঢ় ' ও 'পশ্চিম রাঢ়'। প্রধানত বীরভুম, বাঁকুড়া, বর্ধমান (আসানসোল ও দুর্গাপুর মহকুমা) পুরুলিয়া ও মেদিনীপুর (ঝাড়গ্রাম ও মেদিনীপুর সদর মহকুমা), মিলিয়ে 'পশ্চিম রাঢ়'। বাকি অংশ 'পূর্ব রাঢ়'। লক্ষণীয়-ভূপ্রকৃতির গঠন, অধিবাসীদের মুখের ভাষা ও প্রাচীনতর জীবন ভাবনা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির নিরিখেই এই বিভাগ।

২

লাল কাঁকুরে মাটির দেশ এই পশ্চিম রাঢ়। তুলনায় পূর্বরাঢ় কৃষ্ণ মাটির রাজ্য। পশ্চিমরাঢ় পাহাড় পর্বত ডুংরি দাড়াং তড়াগড়ায় পূর্ণ। পূর্বরাঢ়ে সমতল মাটি। বস্তুতঃ আমরা যতই এগোব ভাগীরথীর দিকে, কলকাতা কৃষ্ণনগর নবদ্বীপ অভিমুখে, ততই পাল্টে পাল্টে যাবে ভূখণ্ডের মাটি, মানুষের জীবন ও সংস্কৃতি। পূর্ব রাঢ়ে অধিক শিক্ষা, অধিক চেতনা, অধিক চতুরতা, নতুন কৃষ্টি ও কালচার। পশ্চিম রাঢ়ের মানুষ এখনো যে-তিমিরে সেই-তিমিরেই। আর্য সভ্যতা এখানে বিস্তৃত হয়েছে অনেক দেরিতে। আদিম অস্ত্রাল জাতির বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় এদেশ সঞ্জীবিত। বনবাদাড় টিলায় তাঁদের বাস। দুংড়ি দাড়াং বনপাহাড়ে খালে বিলে নদীতে এঁদের বিচরণ। রুক্ষ কল্লাচ মাটিতে এঁদের জীবন। মনে হচ্ছে মহাবীর-বর্ধমানের পেছনে কুকুর লেলিয়ে ছিলেন এই পশ্চিম রাঢ়েরই তখনকার মানুষ। ষোড়শ শতকেও এঁরা মুকুন্দের ভাষায় অস্পৃশ্য ছিলেন। অবশ্য অস্পৃশ্যতা যায় নি এখনো এ রাজ্য থেকে। সেই পুরোনো রীতিতেই রাঢ় বর্তমান। পশ্চিমরাঢ়ে তার পরিবর্তনহীন রমরমা। এখানে বেশি আছেন সাঁওতাল কোল কোঁড়া মুণ্ডা মাহলী সর্দার খেড়ে শবর বীরহড়। আর ছড়িয়ে আছেন বাউরি বাগদি হাড়ি ডোম শুঁড়ি ঢোকরা করগা খয়রা চুনার পাথরা প্রভৃতি তথাকথিত নিম্ন জাতি উপজাতির লোকেরা। বামুন কায়েত ক্ষত্রিয় যে নেই, তা নয়, তাঁদের সঙ্গেই আছেন কামার কুমোর ছুতোর বেনে নাপিত

তাঁতি পোদ্দার গোয়ালা সদগোপ মোদক শাঁখারী প্রভৃতি। এঁদের সকলেরই নানা গোত্র, নানা থাক, নানা সমাজ, নানা সম্প্রদায়।

এঁদের সকলের গ্রামেই আছেন গ্রাম দেবতা। আছে ঝাড়ফুক তুকতাকের আসর, নির্বিবাদে ঘুরে বেড়ায় ওঝা, গুণীন, জান-গরু ও চেলার দল তাগা-তাবিজ জড়িবড়ি নিয়ে। বাধা নিষেধ রীতিনিয়ম সংস্কার বিশ্বাস এখানে কত কি? একবিংশ শতকে পেঁছে যাবে এই রাঢ় দেশও। কিন্তু কবে মধ্যযুগীয় পোষাক ঝেড়ে ফেলবে এখানের এই দিনমজুর মানুষেরা? অথচ শত দুঃখ, শীতল দারিদ্র লক্ষ কুসংস্কার থামাতে পারেনি এঁদের পাইল পার্বণ পুজো-আজাকে। এখনো গ্রামদেবদেবীর থানেথানে নাচ গান বাজনার আসব, এখনো উল্লাসের সঙ্গে দেবদেবীর প্রতি সকৃতজ্ঞ কৃচ্ছ্রসাধনা॥

রাঢ়ের পূর্বপুরুষ পুজো □ লোকায়ত দৃষ্টিকোণ

রাঢ়ের লৌকিক সংস্কৃতির প্রধান এক অভিব্যক্তি তার লোকধর্মে, তার গ্রাম-ধর্মে। ঈশ্বরতত্ত্বের দুরূহজটিল কল্পনায় তা প্রকাশিত হয়নি। তা পরিস্ফুট হয়েছে তার গ্রামদেবদেবীদের পুজোআজায়। ঈশ্বরভাবনা সমাজের অনেক পরবর্তী আবিষ্কার। তখন সমাজে জম্মে গেছে সেই শিক্ষিত চতুর সম্প্রদায়, যাদের মন ও বুদ্ধি হয়ে উঠেছে পরিশীলিত। কিন্তু গ্রামদেবদেবীদের ভাবনা এসেছে প্রত্ন মানুষের আদিম জীবন চেতনা থেকে। জন্মের পরই মানুষ প্রথম যা চায়, তা হলো তার আত্মরক্ষা। এটা মানুষ মাত্রেরই সহজাত, এটা তার প্রাথমিক বোধ, কিন্তু শ্রেষ্ঠতম তাগিদ। এর মূলে ছিল ভয় বিস্ময় আর অজ্ঞানতা। প্রত্ন মানুষ ভয় করতে শিখেছিল যেমন হিংস্র প্রাণীকে, প্রকৃতির রহস্যকে, পাহাড়-পর্বত নদীকে, আকাশকে, তেমনি সে ভয় করতে শিখেছিল মৃত্যুকেও। বস্তুতঃ মৃত মানুষকে তার ভয় ছিল সবচেয়ে বেশি। যেহেতু সে-মানুষটি এতদিন তার সঙ্গে জীবনযাপন করেছে, খেয়েছে বসেছে শুয়েছে, কাজকর্ম করেছে, আনন্দে হেসেছে, বেদনায় কেঁদেছে, সে যখন মৃত্যুতে নিথর হয়ে গেল, প্রত্যক্ষদর্শী ভয় পেল তখনই। আরো ভয় জাগলো, যেহেতু মৃত্যুর পরের খবর সে জানতে পারছে না কিছুতেই। জানতে পারছে না যেমন, তেমনি তাকে নিয়ে তার কল্পনাও কম ছুটছে না। তখন তাকে, তার মৃত্যুকে মানুষ তার নিজের কল্যাণ-অকল্যাণের সঙ্গে জড়িয়ে ফেললো। রোগ বিপদ-আপদ মড়ক · মন্বন্তর খরা বন্যা বজ্রপাত আসে প্রকৃতির অমোঘ নিয়মেই। প্রত্ন মানুষ তা বুঝতে পারেনি। তাই সে কল্পনা করে নিলে, এ সবই ঘটছে মৃত তার প্রিয় ব্যক্তি বা আত্মীয় বা পূর্বপুরুষের অসন্তুষ্টির জন্যেই। তাকে ঘিরে তাই সে কল্পনা করে নিল ভুত প্রেত দত্যি দানা ডাইনী পুকোস আত্মা প্রভৃতি। সে বিশ্বাস করলে, সংসারের যত অশান্তি সেই মৃত ব্যক্তিটির রুষ্টতার জন্যেই।

অমনি সে প্রয়াস চালালে মৃত সেই মানুষটির কল্পিত আত্মাকে সন্তুষ্ট করতে। সেই হলো তার পুজো—মৃত মানুষের পুজো।

সুতরাং মৃত মানুষের পুজোর মধ্যে ছিল ভয়, ছিল আত্মরক্ষা বা আত্মকল্যাণের তাগিদ। সেখানে কৃতজ্ঞতা ছিল না। কৃতজ্ঞতা এসেছে আরো পরবর্তী স্তরে। যখন সে বুঝতে শিখেছে তার সমাজকে, গ্রামকে। এবং আত্মীয় স্বজন প্রিয়জন সম্পর্কে তার ধারণা উঠেছে গড়ে। মানুষ দেখেছে তার মাতা পিতা ঠাকুর্মা ঠাকুর্দা বা গ্রামমোড়লকে, যাঁরা সারা জীবন ধরে কায়ক্লেশে তাকে রক্ষা করে চলেছিল খাদ্য দিয়ে, ওষুধ দিয়ে, বিপদে ছুটে এসে, সর্বদা আশ্রয় দিয়ে। এমন বোধ জাগলেই জাগে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা। সেই প্রত্নসমাজেও একদিন সে-কৃতজ্ঞতা জেগেছিল। আদিবাসী সাঁওতাল সমাজেও তার প্রমাণ আছে এখনো। তাঁরা যখন জাহের থানে পুজো করেন দেবদেবীদের, তখন তাঁরা সেই দেবদেবীদের সঙ্গেই গ্রামস্রষ্টা বা গ্রামমোড়ল বা বংশের আদিমানুষ বা কর্তাকেও পুজো করেন, ঠিক দেবদেবীর মতোই 'খুঁড়' বা পুজোবেদী তৈরী করে, ফুল ও বলিদান দিয়েই। সাঁওতালদের প্রধান দেবদেবী ছজন—জাহের হাড়াম, জাহের বুড়ি, মারাংবুরু, মড়েক, তরুইক ও সীমাসাড়ে। এবং সাত নম্বরে পুজিত হন মৃত পূর্বপুরুষ কর্তা বা মোড়ল।[১] পূর্বপুরুষের খুঁড়ে কল্পিত হয় একজন মাত্র মানুষ—সাধারণত তিনি বংশের কিংবা গ্রামের আদি মানুষ। অবশ্যই তিনি মারা গেছেন অনেক যুগ আগে, কেবল পুরুষানুক্রমে শোনা যাচ্ছে তাঁর নাম। কিংবা নামও জানা যায় না। তিনি পুজিত হন 'কর্তা বা ঠাকুর' অভিধায়।

শুধু সাঁওতাল সমাজেই নয়, দেশের অন্য প্রায় সকল সম্প্রদায়ই পূর্বপুরুষ পুজো করে আসছেন। শুধু রাঢ়েই নয়, সারা বাংলা, এমনকি সারা ভারতেই অতি প্রাচীনকাল থেকে পূর্বপুরুষকে পুজো করা বা স্মরণ করার রীতি চালু হয়েছিল। হিন্দু সমাজে তো এ নিয়ে চমৎকার শাস্ত্র গড়ে উঠেছিল। শাস্ত্রবিদরা ঘোষণাই করেছিলেন 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা' এবং 'পুত্র পিণ্ড প্রয়োজনম্'। অর্থাৎ পুত্রের জন্যেই স্ত্রী এবং পিণ্ডলাভের জন্যেই পুত্র। এই পিণ্ডই হলো পূর্বপুরুষ পুজোর উল্লেখ্য নিদর্শন। এ হলো সেই পিতৃতর্পণ, শ্রাদ্ধকর্ম বা প্রেতকর্ম। সারা দেশে তার নানা রূপ, নানা রীতি। সাধারণত সমতল রাঢ়ে শিক্ষিত ও উঁচু সমাজে তার নাম তর্পণবিধি। আর পশ্চিমরাঢ়ের সর্বত্র তার চেহারা স্বতন্ত্র। তবে সেখানেও সকলের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল—মৃত মানুষের জন্যে অশৌচবিধি, প্রেতকর্ম, শ্রাদ্ধশান্তি, সম্বাৎসরিক শ্রাদ্ধ, বাৎসরিক শ্রাদ্ধ ও গয়াপিণ্ড। মৃত মানুষের প্রেতযোনি মোচনের জন্যেই এসব শাস্ত্রবিধি।

১. বিস্তৃত আলোচনা : 'রাঢ়ের আঞ্চলিক দেবতা : লোকসংস্কৃতি (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৯) প্রবন্ধ—'সাঁওতালী দেবদেবী'।

পাঁজিতে এর সঙ্গে আছে মহালয়ার ভোরে বা শ্যামাপূজোর সময় দীপান্বিতা অমাবস্যার পিতৃতর্পণের নিয়ম।

কিন্তু পশ্চিমরাঢ়ের সাধারণ সমাজের নিয়মরীতি একটু স্বতন্ত্র। সাধারণতঃ আদিবাসী তপশিলী ও নিম্নহিন্দু ও নবশাখ সমাজে নানা স্থানে নানা করণীয়। কোথাও গয়াপিণ্ডের অনুকরণে 'পয়াপিণ্ড'—কার্তিক মাসে শ্যামাপূজোর অমাবস্যায়। কোথাও 'ছাতুপিণ্ড'—চোত সংক্রান্তিতে ছাতু সহ পিণ্ডদান। কোথাও পৌষসংক্রান্তি বা ১ মাঘ বা ১ বোশেখ 'অন্নপিণ্ড'। তবে সবস্থানেই দেখি নিম্নোক্ত চিত্রটি ঃ

ঘরে ঘরে এদিন তৈরি হয় 'অন্নডোংলা'। একটি সিঁয়াপাতার (সেলাই শাল পাতা) ডোংলায় থাকে কিছু সেদ্দ চাল, ডাল, কাঁচা আনাজ, নুন, ও অন্যান্য নিত্য খাদ্যদ্রব্য। পিতৃহীন বা মাতৃহীন ব্যক্তি (অবশ্যই পুরুষ) এদিন তেল না-মেখে চান করবেন, মাথার চুল আঁচড়াবেন না, ভিজে কাপড়ে থাকবেন বা কাচা কাপড় পরবেন। কুল-পুরোহিত বা ব্রাহ্মণ এলে পূর্বমুখে দাঁড়িয়ে সেই সুসজ্জিত ডোংলাটি তিনি তুলে দেবেন ব্রাহ্মণের হাতে। তারপরে দক্ষিণা দিয়ে প্রণাম। এই হলো পুত্র পিণ্ড প্রয়োজনম—পশ্চিমরাঢ়ে বাঁকুড়া পুরুলিয়ায় এর নাম 'হাতে-তুলা'। শালপাতার ঐ ডোংলাকে বলে ভুজ্জি। বছরে দুবার এ রীতির চল্। একবার শ্যামাপূজোর অমাবস্যায়, অন্যবার চোত সংক্রান্তিতে। এ হলো গণশ্রাদ্ধ, এছাড়া মাতাপিতার মৃত্যু দিনে তো অনুরূপ ক্রিয়া আছেই। সে হলো ব্যক্তিগত।

মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাংশে, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার কোনো কোনো স্থানে শ্যামাপূজোর সময় আলোচালের গুঁড়ি দিয়ে মেঝেতে একটা চৌকো ঘর আঁকা হয়। তার উত্তরে থাকে ঢোকার পথ, দক্ষিণে থাকে বেরোবার রাস্তা। ঘরটার ভেতরে আরো ছোটো ছোটো ঘর বা রেখা টানা হয়—বাবা জ্যেঠা কাকা বা ঠাকুর্দা, তার বাবা, তার বাবা, এমনি সব নামে। প্রতি ঘরে রাখা হয় কুল বা কাঁটাল পাতা। কেউ কেউ কলাপাতার টুকরো দেন। তার ওপরে রাখেন গোটা সুপুরি। সব শেষে দেওয়া হয় গোটা ধান, গোটা মুগ, কালোতিল, গোটা যব। বিশ্বাস, এই ঘরে ঘরে এসে বসবেন পূর্বপুরুষেরা। তাঁদের নামে নৈবেদ্যও দেওয়া হয় থালা বা পাতার ওপর—মিষ্টি, নানা ফলমূল ও গুড়পিঠে। কোথাও নামে নামে ঘিয়ের কাঠিও জ্বালানো হয়।

দক্ষিণ পশ্চিম বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের কোনো কোনো স্থানে অনুন্নত সমাজে পিণ্ডদানের অভিনব রীতি। কোনো উঁচু দাওয়ায় পাতা হয় কলাপাতা। তাতে দেওয়া হয় শাদা ভাত, মাছের ঝোল। থালায় পিঠে পায়েস, কুঁদরী, আলু ঝিঙে, ধিকাজলা প্রভৃতি ভাজা। প্রথমে জলধারা দেওয়া হয় পাতার চারদিকে। তারপর মনে মনে নিবেদন করা হয় পিতৃপুরুষকে। সবশেষে তা থেকে প্রসাদ

দেওয়া হয় বাড়ির সকলকে। পুজোস্থানটি ধোয়া হয় জল ঢেলে। সেই জল মাথায় ছোঁয়ান সকলে। প্রধানত মেদিনীপুরের সুবর্ণরেখা, বাঁকুড়ার কাঁসাই-কুমারী, পুরুলিয়ার দামোদর নদীর তীরবর্তী কৈবর্ত নমঃশূদ্র প্রভৃতি সমাজে এ রীতিটির খুব চল্।

সাঁওতাল সমাজে পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে পুজো করারও রকমফের আছে। মৃতকে সন্তুষ্ট রাখতে তাঁদের প্রচেষ্টাও লক্ষণীয়। মৃতের নামে ঝাড়ফুক তো আছেই, তাঁর নামে মুরগীর বাচ্চা বলি হয়। কেউ কেউ সদ্য মৃতের চিতায় মুরগী বাচ্চা বেঁধে দেন। মদ উৎসর্গ হয় বহুস্থানে। বিশ্বাস, এতে তুষ্ট থাকবে মৃতের আত্মা। এবং তাঁর আত্মা মিশে যাবে আদিপিতা 'পিলচু হাড়াম' বা আদিমাতা 'পিলচু বুড়ি'র সঙ্গে। তখন তাঁদের দ্বারা আর কোনো অমঙ্গল হবে না। মৃতের অস্থি তাঁরা ভাসিয়ে দেন দামোদরের জলে। পুরুলিয়ার তেলকুপি ঘাটে সে নিয়ে তাঁদের মেলা বসে যায়। যেমনটা চোত সংক্রান্তিতে মেলা বসে সুবর্ণরেখার তীরে, যেখানে ছাতুপিণ্ড দেন সেখানের আদিবাসীরা। কোনো কোনো সাঁওতাল পরিবার মৃতদেহ বহনের সময় ছড়িয়ে দেন তুলোর বিচি (কাপাস অথবা সিমুল)। বিশ্বাস, অন্য কোনো দুষ্ট আত্মা তাঁর পূর্বপুরুষের আত্মাকে বিনষ্ট করবে না।

পূর্বপুরুষ পুজোর চল্ আছে পৃথিবীর অনেক দেশেই। খোদ রাশিয়ার লোকেরাও আত্মীয়ের মৃত্যু দিনে বা মৃত্যুবার্ষিকীতে উপোস করে, দুধ চাল ফুটিয়ে নুন দিয়ে খান, সন্ধ্যায় প্রার্থনাস্থানে সমবেত হয়ে মৃতের উদ্দেশে প্রার্থনা জানান।[১] লণ্ডনেও এমন অবস্থায় অনেক পরিবারে প্রার্থনার আয়োজন আছে।

হিন্দুদের পুজোয় সংকল্পের রীতি আছে। তাতে উল্লেখ করতে হয় পুজার্থীর নাম গোত্রাদি। আর গোত্রাদির উল্লেখ মানেই পূর্বপুরুষকে স্মরণ করা। সুতরাং হিন্দু ধর্মাচারে স্পষ্ট বা অস্পষ্ট ভাবে কাজ করেছে টোটেম ট্যাবু বা প্রাচীন কৌমভাবনা।

সতর্ক দৃষ্টিতে না-এলেও, পূর্বপুরুষেরা এখনো নানাকৃত্য পুজো পাচ্ছেন : এক. কোনো কোনে স্থানের পুজোর মূলে আছেন হিন্দ বা মুসলমান ধর্ম-গুরুরা। অবশ্য ধর্মগুরুকে, ঠিক দেবতার মতো পুজোর প্রচলন হয়েছে প্রায় তিন চার হাজার বছর আগে থেকেই। বর্ধমান-মহাবীর, বুদ্ধদেব প্রমুখ পুজো পেয়েছেন প্রাচীন ভারতেই। অন্যদেশে হজরত মহম্মদ বা যিশুও পুজো

---

১. প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী সুরকার ও গীতিকার ডঃ ভূপেন হাজারিকা ২৪মে ১৯৮৮ তে সোভিয়েতদেশে যান সে দেশে অনুষ্ঠিত একটি উৎসবে যোগদিতে। তাঁর সেই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত আনন্দবাজারপত্রিকায় ছাপা হয় ৭.৮.১৯৮৮তে। বর্তমান তথ্যটি তাঁরই রচনাটি থেকে নেওয়া।

পেয়েছেন নিজ নিজ সময়ে। বাংলা দেশে ধর্মগুরুকে মান্য করার ইতিহাস চর্যা-গীতিকাতে মেলে। তামাম ভারতবর্ষে চৈতন্যদেবই প্রথম মানুষ, যিনি সমগ্র বৈষ্ণব সমাজে ঘরে ঘরে গ্রামে গ্রামে দেবতা (সাক্ষাৎ ঈশ্বর) বলে পুজো পেয়ে আসছেন তাঁর জীবিত কাল থেকেই। অদ্বৈত শ্রীবাস নরহরি নিত্যানন্দ জাহ্নবা এবং সমস্ত বৈষ্ণব মহান্ত ও মহাজন কবিরা পুজো পাচ্ছেন এখনো। আধুনিক কালে ঠাকুর রামকৃষ্ণ, সারদামণি, বিবেকানন্দ, অনুকূল, হরনাথ-কুসুমকুমারী, বামাক্ষেপা, তৈলঙ্গস্বামী, লোকনাথ ও দেবতা জ্ঞানে পুজো পেয়ে চলেছেন। সম্প্রতি জাতি ধর্ম বর্ণ সম্প্রদায় দল মত আস্তিক নাস্তিকের নিত্য পুজো পাচ্ছেন জীবিত মানুষ বালক ব্রহ্মচারী। ভক্তরা তাঁকে বলেছেন, চৈতন্যের নতুন অবতার। তাঁর সামান্য দর্শন স্পর্শন ও সঙ্গলাভের জন্যে তাঁরা আকুল। তাঁর সান্নিধ্য ঈশ্বর সান্নিধ্য বলে বিবেচিত। দেশের বহু বহু বিখ্যাত ব্যক্তিরাও এসেছেন তাঁর সান্নিধ্যে, তিনি আশীর্বাদ করেছেন তাঁদের মাথায় হাত রেখে। ছবিতে দেখছি, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, অজয়কুমার মুখার্জী, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, প্রিয়রঞ্জন সেন, ডঃ রমা চৌধুরী, ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, আক-আকবর খাঁ, মহম্মদ রফি প্রমুখ তাঁর আশীর্বাদ নিচ্ছেন। এছাড়াও আজকের ডান বাম রাজনীতির বিখ্যাত নেতা ও মন্ত্রীরাও তাঁর আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা নিচ্ছেন সে-ছবি ছাপা হয়েছে 'আজকাল' ও 'আলোকপাত' মাসিকে।[১]

হিন্দুদের মতোই মুসলিম দুনিয়ায় পুজো পাচ্ছেন আবহমান কাল ধরে পীরফকির মুর্শিদরা। ফুরফুরা শরিফের দাদাপীর, ঘুটিয়ারী শরিফের পীর বড়খাঁ, হড়োয়ার গোরাচাঁদ, মেদিনীপুরের হিজলীর পীর মসনদ্ আলি, বর্ধমানে পীর বহরম ও খক্কোর বাবা, বাঁকুড়ার লোকপুরের পীর সাহেব, বিষ্ণুপুরের কুরমান সাহেব, বীরসিংহপুরের নিরগিন শাহ প্রভৃতি। এঁরাও যে রক্তমাংসের মানুষ ছিলেন, তেমন সাক্ষ্য দেয় স্থানীয় ইতিহাস। এঁরা কেউই কাল্পনিক পীর নন। এঁরা পূজিত হন নিত্য। ভক্তরা এঁদের আস্তানায় এসে জিয়ায়ৎ (প্রার্থনা) করেন। মৃত্যুর দিন ধরে মেলা বসে যায়। বহু হিন্দুও পুজো দিতে যান। এঁরা অনেক সময়েই পূজিত হন ভয় ভক্তির দেবতা বলে।

দুই. দুঃসাহসিক বা অলৌকিক কাজকর্মের জন্যে কিছু লোকও পুজো পাচ্ছেন নানা দেশেই। কেউ কেউ পুজো পাচ্ছেন ন্যায় নীতি ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রাম করে, কখনো-বা প্রাণ বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়ে। বিশ্বাসী তেমন পুরুষের নাম করবেন যিশুখ্রীস্ট। রোগে অসুখে ওষুধ ও সেবা দিয়ে, চরম

১. পরিচিতি (১৯৭৮)—অমৃতবাণী পরিবেশক, কল্যাণনগর, ২৪-পরগণা, পৃ. ২৫-৭৮

বিপদে মানুষকে উদ্ধার করে, ভয়ঙ্কর মুহূর্তে মানুষকে আশ্রয় দিয়েও একশ্রেণীর মানুষ দেশপূজ্য হয়েছেন। তবে সেকালে পুজো পেতে এসব গুণের সঙ্গে অবশ্যই অলৌকিক শক্তির দরকার ছিল। এবং সে শক্তির প্রচার করেছিল গুণ-মুগ্ধ ভক্তের দল বেশ চমৎকার ভাবেই। বীরত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই কালুবীর বা বাগরাই সিংয়ের পুজো।

তিন. সেকালের মানুষ সব থেকে ভয় করতো অপঘাত মৃত্যুকে, ভয় করতো শিশু মৃত্যুকে। তাদের ধারণা ছিল, এই শ্রেণীর মৃত্যু যাদের, তাদের আত্মা কিংবা ভূত শান্ত হয় না কিছুতেই। তারা সব সময় সুযোগ খোঁজে মানুষের ক্ষতি করার। এজন্যে নানা উপায়ে সেকালের মানুষ এ সব মৃত মানুষকে তুষ্ট রাখার চেষ্টা করেছে। তেমন উদাহরণ মিলছে বাঁকুড়া জেলার থুমপাথরের ভাসুর-বুয়াসিন, মেদিনীপুর গ্রামের খোকা-খুকি, দেমুসনার ননদভাজ পুজোর মধ্যে। এখনো পশ্চিম রাঢ়ের সর্বত্র অপঘাত মৃত্যু বিষয়ক ঝাড়ফুক, 'তুকতাক' (ঠিক করা) ওঝা, গুণীন সগৌরবে বিদ্যামান। আত্মহত্যা (বিশেষ 'গলায় দড়ি') বিষয়ে এখানের মানুষের সংস্কার গুলিও অদ্ভুদ। দেব-দেবীর থেকে অধিক করে এগুলিকে যেভাবে তারা মানে, তাও এক ইতিহাস। রোগ, অসুখ বিপদ, হত্যা, খুন, মৃত্যু, মড়ক, খরা, ডাকাতি সবই জুড়ে দেওয়া হয় এসব মৃত্যুর সঙ্গে। এই জন্যেই শিশু-মৃত্যু অপঘাত-মৃত্যুকে নিয়ে এদেশে অসংখ্য লোককাহিনী গড়ে উঠেছে।

চার. রাঢ়ের কোনো কোনো স্থানে এমন কিছু গ্রামদেবতা আছেন, যাঁদের পুজারীরা কিংবা গ্রামবাসী অথবা কোনো গোষ্ঠী দাবি করেন তাঁকে পূর্বপুরুষ বলে। পাথুরে প্রমাণ না-পেলেও তাঁদের মুখে শোনা যায় চমৎকার এক একটি বংশ মালিকা। পুরুষের পর পুরুষের নাম তাঁরা বলতে থাকেন গড়-গড় করে। এঁরাই সাধারণত ব্যক্তির পুজো থেকে পারিবারিক পুজোয়, পারিবারিক পুজো থেকে গ্রামের পুজোয়, কখনো-বা অঞ্চলের পুজোয় সমাসীন হয়েছেন। মেদিনীপুর জেলার গদামৌলির পুটুবুড়া, বাঁকুড়ার দুবরাজপুরের মাঝিবুড়া অথবা জিড়রার বুড়া-বুড়ি পুজো তার প্রমাণ।

আমাদের দেশে চলিত আছে 'বাস্তু' পুজো। প্রাচীনেরা বলেন, বাস্তুতে যে দেবতা থাকেন, এ পুজো তাঁরই। কারো কারো ধারণা, বাস্তুপুজো মানে বাস্তু স্রষ্টা মানুষের পুজো। সে অর্থে এপুজো বর্তমান বসবাসকারীদের পূর্বপুরুষ পুজো অথবা কোনো না কোনো অর্থে পূর্বজ মানুষ পুজো।

সমগ্র বীরভূম, উত্তর পশ্চিম বাঁকুড়া এবং বর্ধমানের কোনো স্থানে গোঁসাই, ব্রহ্মচারী, জটাধারী বা সন্ন্যাসী পুজো দেখা যায়। এঁরা সর্বত্রই যে মানুষ পুজোর রূপান্তর, তা নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কেউ কেউ যে মানুষ ছিলেন না, তাও বলা কঠিন। সাধারণ্যে একটি ধারণা আছে, বামুন ছেলের

অপঘাতে মৃত্যুতে ব্রহ্মচারীর উদ্ভব। যেমন আত্মহত্যাকারী বামুন মরে হয় ব্রহ্মদৈত্য। উত্তর ভারতের কোনো কোনো স্থানেও অত্যাচারিত হয়ে আত্মহত্যাকারী মানুষ দেবতায় পরিণতি লাভ করেছে। রাজপুতনায় 'মনসারাম' নামে যে 'ব্রহ্মদত্তি' পুজো পায়, তিনি আসলে মনসারাম নামে একজন মানুষ, রাজা তেজসিংহের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে যিনি আত্মহত্যা করেছিলেন। সিউড়ির খটঙ্গা গ্রামে এমনি এক নিহত ব্যক্তি যে ব্রহ্মদত্তি হয়েছেন, তেমন লোক-কাহিনীর প্রচার আছে। সেকালে কোনো কোনো সন্ন্যাসী নানা কারণেই জনগণের ভয়, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন। গ্রাম-প্রান্তে এসে এঁরা ডেরা বাঁধতেন, সঙ্গে সঙ্গে চেলার দল এঁদের প্রচারে নেমে যেতেন, নানা সত্যি মিথ্যা গল্প কাহিনী বলে গ্রামবাসীকে ডেরায় টেনে আনতেন। সাধু-বাবার চরণবন্দনাকে তাঁরা ইহলোকের পরলোকের কল্যাণ বলে ঘোষনা করতেন। জানাতেন মোক্ষ মুক্তি অর্থ সম্পদ সুখ-শান্তির চাবিকাঠি তিনি। সাধুবাবা যেন দয়াকরে, গ্রামের ভেতরে ভিক্ষেয় যেতেন। মা বোনদের মাথায় হাত রেখে ধনপুত্রের আশীর্বাদ দিতেন। আবার সুযোগ বুঝে কখনো-বা 'গৃহস্থের বয়স্থা কুমারী কন্যাকে, বাল-বিধবা গ্রামবধূকে, সমাজ-বন্ধন শিথিল কোনো নিচু সম্প্রদায়ের বউড়িকে রাতের অন্ধকারে নিয়ে পালাতেন 'ভিক্ষুণী' করবার উদ্দেশ্যে। এজন্যে অনেক সময় আতঙ্কে থাকতেন জনগণ। ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলের কথায়, এঁরাই ভোলবদল করে একালে দেবতারূপে পূজা পেয়ে যাচ্ছেন। এমন সন্ন্যাসী পাঁড়ুক রামনগরের সন্ন্যাসী। পাথরচাপুড়ি গ্রামের দাতাসাহেব ও বক্রেশ্বরের খাকি-বাবা, দুজনেই সিপাহী বিদ্রোহের পলাতক ছিলেন। এখন এঁরা পুজো পাচ্ছেন দেবতার মতোই। ডঃ সুধীর করণ লিখেছেন, গ্রাম দেবদেবীরা মূলত পুরুষ পূর্বপুরুষ এবং প্রকৃতির বিভিন্ন রূপেরই আত্মা। কথাটি স্বীকার্য।

পাঁচ. সাম্প্রতিক কালে মহাপুরুষ ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব পুজোর ধুম চলেছে। যার সঙ্গে যোগ নেই ভয়, বা ভক্তি বা ভূত প্রেত আত্মার। প্রথম দিকে এর মধ্যে আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি অবশ্যই ছিল। ক্রমশ তা পর্যবসিত হয়েছে ফ্যাসানে। নিছক আমোদ স্ফূর্তিও আছে। হুজুগ তো আছেই। মৃত কবি, লেখক, বিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী বা আত্মত্যাগী সমাজসেবী থেকে চিত্রাভিনেত্রী, সুরসাধক, শিল্পী সকলেই পুজো পাচ্ছেন বিচিত্র কারণেই। ইদানিং দেখছি টাকাওয়ালা ব্যবসায়ীর পুজোও। সবই যেন নিজ নিজ ক্ষেত্রে 'হিরো ওয়ারসিপ'। এককথায় ব্যক্তি পুজো চলেছে যুগে যুগে দেশে দেশে। তা হয়তো গ্রামদেবতা পুজোর মতো নয়, কিন্তু রূপে রীতিতে আদর্শে ও সংস্কারে বড় যুগোপযোগী সন্দেহ নেই। এবং মধ্যযুগ হলে এঁরাই পুজো পেতেন ঠিক গ্রাম-ঠাকুরের মতোই। ফুলে জলে চিনি বাতাসা শীতলে॥

রাঢ়ের পূর্বপুরুষ পূজা

লোকসংস্কৃতি

লখন মাঝি

লখন মাঝি গ্রামদেবতা। সারেঙ্গা গ্রামের সবচেয়ে পুরোনো দেবতা তিনি। পশ্চিমবাংলার সর্বত্রই আছেন গ্রামদেবতারা। কিন্তু এমন নামে, আর এমন পদবীতে আর কোথাও কোনো গ্রামদেবতা নেই। কিন্তু নামেই তিনি স্বতন্ত্র নন। পুজোবিধি ও ভোগরাগেও তাঁর নিজস্বতা বড় প্রকট।

কিন্তু না, তিনি গ্রামদেবতা ছিলেন না আদিতে। তিনি ছিলেন একান্তই ছা-পোষা মানুষ। সংসার করেছেন আর দশজনের মতোই। এসেছেন দূরদেশ নেপাল থেকে, একটা মড়া কাঁধে করে। হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটেছেন সর্বত্রই। বসবাসের উপযোগী জমি খুঁজেছেন দেশে দেশে। পথঘাট, নদীনালা, পাহাড়, পর্বত পেরিয়ে তিনি এসেছেন রাঢ়ের এই দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্তে। এখানে কংসাবতীর ফটিকের মতো জল, চোখ জুড়ানো সবুজ তৃণভুমি, ঘন সবুজ বন আর নদী, আর বনের ফুরফুরে হাওয়া। থমকে দাঁড়ালেন তিনি। সঙ্গিনীটি বললেন, দাঁড়ালে যে।—আর যাব না।—কিন্তু এখানে, এই মানুষহীন অঞ্চলে ?—হ্যাঁ। বসে পড়লেন লখন। কাঁধ থেকে নামালেন মৃতদেহটি। পরীক্ষায় বসলেন, এখানে থাকা যাবে কিনা। পোঁড়ি থেকে বার করলেন মুরগীর সেই ডিমটি। এই মুহূর্তে বাচ্চা ফুটলে এটাই হবে তাঁর বাসক্ষেত্র। বাচ্চা তো ফোটে নি অনেক স্থানেই। কিন্তু দেখতে দেখতে বাচ্চা ফুটে বেরোলো এখানে, সে ঘুরতে লাগলো মৃতদেহটির চারপাশে। না, আর এগোবেন না তিনি। রেহাই পেলেন সঙ্গিনীটিও। বহুদিন পরে পড়লো তাঁর স্বস্তির নিঃশ্বাস। দেখতে দেখতে মৃতদেহ থেকে বেরিয়ে এলো একটা জীয়ন্ত গাছ। তাতে ফুল ফুটলো। ফল ধরলো। মড়াটাকে 'মোট' (মন্দির, কবর) দিলেন তিনি। পুজো করলেন জল ছিটিয়ে। মড়াটা তার প্রিয় ভাই সাধুমের। অলৌকিক বিদ্যায় তাঁর সমান ছিল না কেউ। সেই বিদ্যাই তিনি শিখিয়েছিলেন দাদাকে। বলেছিলেন, তাঁর এই দেহ যেখানে থাকবে, সেখানে অভাব হবে না মাংসের শস্যের ফলমূলের।

এগিয়ে চলেছে কাহিনী। একদিন পুজো হচ্ছিল জাহের থানে। বলি

হচ্ছিল সব দেবদেবীর নামে নামে। হঠাৎ শেষ বলিটা দেওয়া গেল না কোনো দেবতার নামেই। বেঁকে গেল খড়্গটা শেষকালে। মুশকিলে পড়লেন পূজারী। ধ্যানে জানলেন তিনি—আর কোনো দেবতা নেই। কিন্তু বলিটা দিতেই হবে। কাকে দেবেন? 'জয় বাবা লখন মাঝি' বলেই কোপ দিলেন পূজারী। বলি খণ্ডিত হলো। কিন্তু অদৃশ্য হলেন লখন। পূজারী বললেন, লখনও দেবতা। তিনি গ্রাম-স্রষ্টা। তিনি সকলের বড়ো। রোগে শোকে বিপদে আপদে লোকে নিয়েছে তাঁর কাছে আশ্রয়। আজ থেকেই চলবে তাঁরও পূজো।

লখন সম্পর্কে এমনি প্রবাদ অনেক আছে। সবগুলিতেই বলা হয়েছে তাঁর মানুষ জীবনের কথা। বাঁকুড়া জেলার রাইপুর থানার দু-নম্বর ব্লক সারেঙ্গা। বাঁকুড়া শহর থেকে ৬৩ কি. মি. দক্ষিণে। বাস যোগে যাওয়া যায়। কলকাতা থেকেও সরকারী বাস আছে। বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম। গ্রামে আছেন আরো নানান্ দেবদেবী। গ্রামীন দেবদেবী হলেন: বড়ামবুড়ি, বলদাবুড়ি, ধুলাবুড়ি, বাঘুৎ, বাঁশিসিনি। পৌরাণিক-লৌকিক দেবদেবী হলেন মনসা, শীতলা ও উমাকান্ত শিব। লখন মাঝি আছেন মিশনারি হাসপাতাল যাওয়ার পথে, বাজারের উত্তর দিকে, বাঁ-দিকের এক গলির ভেতরে। মঠ মন্দির নেই। একটি বিরাট ঝোপ। মাঝে একটি বিশাল মহুল (মহুয়া) গাছ। তার চারপাশে কেলেকেঁড়া, আকুঁড়া, শেওড়া প্রভৃতি গাছের লাটা (জট)। মোট আট শতক জমি, বহু পুরোনো গাছের গোড়ায় তা ঢাকা।

লখন মাঝির মূর্তি নেই। তাঁর প্রধান প্রতীক একটি সুপ্রাচীন কল্কে, যা থাকে হুঁকোর মাথায়। তাঁর অন্য প্রতীক পোড়া মাটির অগণিত হাতি-ঘোড়া। সেগুলির তিনটি বড় বড় স্তূপ। স্তূপের ভেতরে মিলেছে নানা আকৃতির খুব প্রাচীন কিছু হাতি ঘোড়াও। প্রধান প্রতীক যে কল্কের মুখটি, তা গোলাকৃতি, তা দু ইঞ্চির ব্যাসযুক্ত। তা আছে মাটিতে পোঁতা। প্রথম পূজো এই কল্কেতে। পরের পূজো হাতিঘোড়ায়। কিন্তু বাদ যায় না গাছ-পূজোও।

কোনো ব্রাহ্মণ তাঁর পূজারী নন। বর্ণ হিন্দুও নন। তাঁর পূজারী গ্রামেরই সাঁওতালেরা। তাঁদের পদবী হেমব্রম।[1] তাঁরাই পূজো করছেন পুরুষানুক্রমে। এক সময় লখনের উপাসক ছিলেন এই সাঁওতালেরাই। তাঁরা দাবীও করেন, লখন ছিলেন তাঁদেরই পূর্বপুরুষ। এখন এঁরা তিন ঘর। তাই পূজো করেন পালাক্রমে। বাড়িতেও প্রতিষ্ঠা করেছেন লখনের হাতি-ঘোড়া। খুশিমতো পূজো করা যায় সেখানে। থানের পূজো হয় সপ্তাহে একদিন,

১. ১৯৭৭ সালে পূজারী ছিলেন শ্রীমোহন হেমব্রম (২২), শ্রীবৈদ্যনাথ হেমব্রম (৪৫)।

প্রতি বৃহস্পতিবার। সংক্রান্তিতে তাঁর পুজো হয় সাড়ম্বরে। বার্ষিকী পুজো হয় পয়লা মাঘ, স্থানীয় ভাষায় এদিনের নাম 'এখ্যান'। থানের চারপাশে এদিন মেলা বসে। দেশজুড়ে লোক আসে। দোকানপাট হাটবাজারে পাল্টে যায় গ্রামের চেহারা। এদিন পুজো দেয় আগন্তুক প্রায় সকলেই। লখন মাঝি এখন সর্বসাধারণের দেবতা। গ্রামে আছেন যে সমস্ত বর্ণহিন্দু কিংবা অনুন্নত ও আদিবাসী সম্প্রদায়, সকলেই পুজো দেয় লখনকে। পুজো দেন মুসলমানেরাও।

পুজোর প্রধান ভোগ (নৈবেদ্য) বড়ো অভিনব। তা হলো 'বড়োভোগ'। অর্থাৎ পবিত্র হেঁড়ে। তা দেশী, কিন্তু খাঁটি। তাঁর অন্য ভোগ হলো মতিহার (পালাদোক্তা) চটা বা চটা তৈরীর জন্যে শুকনো শালপাতা, গাঁজা, গরম মুড়ি কিংবা গুড়মাখানোমুড়ি। দিন বদলেছে। তাই এখন ভোগও পাল্টেছে ফলমূল মিষ্টিতে। বলি হয় পাঁঠা কিংবা মোরগ। মোরগ বলি হয় সব পুজোতেই। পাঁঠা বলির ধুম চলে বার্ষিকীতে। সবই দেন ভক্তের দল। হলুদ তেলও দেন তাঁরা। তবে একটি প্রাচীন রীতি বাজনা বাজানো। পুরুষানুক্রমে বাজনা বাজান গ্রামেরই ডোমেরা। 'মল্লিক' তাঁদের পদবী। তাঁরা পারিশ্রমিক নেন না। না নেওয়াটা তাঁদের সংস্কার।

সাঁওতালি ঠাকুর লখন মাঝি। কিন্তু এখন তিনি গ্রামদেবতা। তাঁর উপর গ্রামবৃদ্ধদের অগাধ অচলা ভক্তি। তাঁরা মাথায় হাত ঠেকিয়ে বলেন, 'যা জানি আমরা লখন মাঝিকেই জানি। ছানাপনা, রোগজ্বালা, মামলামকদ্দমা, ভিড় বিপদ সব কাজেই আমরা তাঁকে মানি।' বলছিলেন উমাকান্ত শিবের বৃদ্ধ পুজারীও—'লখনের মত জাগ্রত ঠাকুর আর নাই।' চাষীরা বলছিলেন তাদের বিশ্বাসের কথা। দূরের বনে যদি ভেঙে যায় গাড়ীর লিঘা, লখনকে মানসিক করলে, ভাঙা গাড়িও ফিরে আসবে বাড়িতে। হাল খসলেও কষ্ট হবে না গাড়োয়ানের। তবে ঠাকুরকে লাগবে বড়োভোগ একটি। মুরগীতে ডিম না দিলেও লোকে তাঁর পুজো দেয়। পরীক্ষার সময় ভিড় দেখি ছাত্রছাত্রীদেরও। রোগে শোকে বিপদে আপদে লোকে নিয়ে যায় লখনের চানজল। পুজারী তাদের দেন মাদুলী। তবে তাঁরা তুকতাক করেন না। শেকড়বাকড়ও দেন না। অথচ ভক্তি আর বিশ্বাস নিয়ে লোক আসেন বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, চন্দ্রকোণা, গড়বেতা এমন কি খণ্ডঘোষ থেকেও। বিয়েসাধিতে গ্রামবাসী লখনের মান্য রাখেন সাধ্যমত। কেউ কেউ দেন পান সুপারী। কেউ বা দেন হলুদ তেল। তা মাখানো হয় বর বা কনেকে। প্রত্যেকটি শুভ কাজে লোকে তাঁর নামে মান্য রাখেন এখনো। চাল রাখেন এক আধ মুঠো করে, যাঁর যেমন সাধ্য। আরো লক্ষণীয় হলো, অন্য দেবদেবীর পুজোর আগেই পুজারীরা ফুল জল ছুঁড়ে

দেন গ্রামদেবতা লখনের উদ্দেশে। লোকে বলে, লখনই সারেঙ্গার স্রষ্টা। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম ছিল সারগা। তাঁর নামানুসারেই সারেঙ্গা। প্রবাদ আছে সারগাকে নিয়েও।

শুধু সারেঙ্গাই নয়, দক্ষিণ বাঁকুড়ার একটা বড়ো অঞ্চলের লোকসংস্কৃতিতে লখনের প্রভাব আছে" অসামান্য। পাশাপাশি দশ বিশটা গ্রামের মানুষ তো তাঁকে মানেনই, বারব্রত পুজোআজাও করেন অনেকে। বড়ো বড়ো খেলায়, তীর ছোঁড়া অনুষ্ঠানে বা শিকারযাত্রায় তাঁরা বিশ্বাস রাখেন তাঁর ওপর। তামাক চাষীরাও চাষ আরম্ভ করতেন তাঁর নাম স্মরণ করেই। এখন প্রায় বন্ধ হয়েই গেছে তামাক চাষ। তবে এখনো যাঁরা বনে পাতা সংগ্রহ করেন, তাঁদের পুজো পান লখন নানাভাবেই। যাঁরা চালান এখনো কিছু হেঁড়ের দোকান, তাঁদের প্রিয়দেবতা বলেই গণ্য হন লখন। মেলায় হয় তীরছোঁড়া, ভেজাবিঁধা, লাফঝাঁপ ও দৌড় প্রতিযোগিতা। সাঁওতালী নাচ ও মুরগী লড়াই তো আছেই।

গ্রামদেবতা লখন মাঝি। সাঁওতালী ভাষায় 'মাঝি' মানে মোড়ল বা সর্দার, যিনি গ্রাম পরিচালন বা রক্ষণ করেন। লোক বিশ্বাস অনুসারে লখন মাঝিও গ্রামস্রষ্টা, গ্রাম-রক্ষণকর্তা। বর্তমান পূজারীদের দাবী, তিনি ছিলেন তাঁদের সাক্ষাৎ পূর্বপুরুষ। অন্তত পঞ্চাশ পুরুষ আগের লোক। সেকালের সেরা গুণীন ছিলেন তিনি। গুণীন ছিলেন তাঁর স্ত্রী লুখাইমণিও। অলৌকিক সাধন করতেন তাঁরা। দাবী সমর্থনে সাঁওতালেরা গড়গড় করে বলে যান নানা প্রবাদ। নৈবেদ্য সম্বন্ধে তাঁরা বলেন, তিনি ভালোবাসতেন দিন যা খেতে, তাই হলো তাঁর ভোগ। 'বড়োভোগ', চালভাজা, কলাইভাজা, চটা, হুঁকো ছিল তাঁর নিত্য আহার্য। অবশ্য সারাদেশেই দেবদেবী কল্পনায় ছায়া পড়েছে জীয়ন্ত মানুষের। তা না হলে দেবদেবীর নৈবেদ্য ঠিক মানুষের মতো হতো না। থাকতো না তাঁদের মানুষের মতোই রাগ, দ্বেষ, হিংসা, প্রতিহিংসা, স্নেহ এবং ভালোবাসা। পুজো অর্থাৎ শ্রদ্ধাভক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ বা নগদ কিছু বাস্তব জিনিস লাভ। তা না-পেলেই রাগ দ্বেষ হিংসা। পেলেই ভক্তের প্রতি করুণা দান। দেবদেবী সম্পর্কিত এই বিশ্বাস এসেছে তো মানুষের নিজস্ব প্রকৃতি থেকেই। অনেক স্থানেই এ বিষয়ে কাজ করেছে নানা টোটেম, ট্যাবু। নানা অলৌকিক যাদুবিশ্বাসও মিশে গেছে বহুস্থানে। অলৌকিক অবাস্তব অনেক কিছুকেই তো মানুষ ভালোবেসেছে সুদীর্ঘ দিন। লখন মাঝির মধ্যেও আছে এসব নানা সংস্কার বিশ্বাস। কালে কালে গড়ে ওঠা ধর্ম সাধনাও মিশে গেছে এর সঙ্গে। ফলে জটিল হয়েছে গ্রামদেবতার মানুষরূপের প্রত্ন স্বরূপটি।

সাধমবংগা ঃ লখন মাঝির কাহিনীটিতে শুনেছি সাধমবংগার কথা। তিনি লখনের প্রিয় সহোদর। তিনি অলৌকিক কিছু বিদ্যেও দিয়েছিলেন দাদাকে। কিন্তু তাঁর মৃত্যু বিষয়টি রহস্যাবৃত। তেমনি রহস্যাবৃত তাঁর মৃতদেহটি বয়ে আনার কাহিনীটিও। সাধম দাদাকে বলে গিয়েছিলেন, যেখানেই রাখা হবে তাঁর মৃতদেহ, সেখানেই অভাব হবে না মাংসের, ফলমূলের, শস্যের। এ সবকিছুই মানুষের খাদ্যের সঙ্গে জড়িত। তাঁর মৃতদেহ থেকে বেরিয়েছিল গাছ, তাতে ধরেছিল ফুলফল। লখনও তাঁকে মেনেছিলেন দেবতা বলে। 'মোট' দিয়েছিলেন নিজ হাতে। পুজারীদের দাবী, সেই 'মোট'ই হলো সাধম-বংগার বর্তমান থানটা।

সারেঙ্গা গ্রামের মাত্র ২ কি. মি. দূরে সাধমের থান। চারদিকে ধানক্ষেত। সারা বছরই চাষ হয়। বর্ষায় ধান ; শীতে গম, তামাক, ছোলা, তিল, তিসি প্রভৃতি। লাহেড় বাজরাও হয়। থানে আছে গাছতলায় একটি হাতি, একটি ঘোড়া। তা-ই তাঁর প্রতীক। সারা বছরে মাত্র দু'বার তাঁর পুজো। প্রথমটি হয় জ্যৈষ্ঠমাসের একদিন, বীজ বোনার আগে বা বোনার দিনে। শেষটি হয় অঘ্রাণে, শোল ধান কাটার আগে। এঁরও ভোগ হলো 'বড়োভোগ'। বলি হয় মুরগী। লখনের পুজারীরাই এঁর পুজারী। পুজারীদের জমিতেই তাঁর থান। জমির মালিক মাত্রেই তাঁর পুজো দেন। অন্যেরা দেননি কখনো। তবে বাধা নেই কারো। জমির মালিকদের উৎসাহে পুজো বলেই দুদিনের পুজোই হয় যেন আড়ম্বর করে।

চাষীদের বিশ্বাস, সাধম কৃষিদেবতা। তিনি ফসলের উৎপাদক ও রক্ষাকারী। তাঁরা বলেন, সাধমের প্রতাপেই ধান বা ফসল চুরি হয়নি এখানে। জলের অভাব হয়নি কোনোদিন। অর্থাৎ লোকগল্প ও লোকবিশ্বাস অনুসারেই সাধম মাঠ-দেবতা, কৃষি-দেবতা। তিনি উর্বরতা বা ফার্টিলিটিভাবনায় বিজড়িত। লোকে অবশ্য আরো নানা অলৌকিক যাদুবিশ্বাস রেখেছে তাঁর ওপর। তাঁর জাহরাতেই (প্রভাবেই) নাকি চাষীদের ভূতের ভয় লাগে না গভীর রাতেও। গভীর রাতে তাঁরা জলসেচ করেন।

সুতরাং লখন ও সাধম সংশ্লিষ্ট পূর্বপুরুষ পুজোর সঙ্গে। সাঁওতালেরা এখনো তাঁদের জাহের থানে নির্দিষ্ট সব ঠাকুরের সঙ্গেই পুজো করেন গ্রামস্রষ্টা পূর্বপুরুষের। জাহের থানের জানবার মতোই চিত্রটি। মোট ৭টি গোল গোল খঁড় (পুজোবেদী) আঁকেন তাঁরা জাহের থানে। কল্পনা করে নেন প্রথম থেকে এসে বসবেন ৬ দেবদেবী—জাহের বুড়ি, জাহের হাড়াম, মারাংবুরু, মড়েক, তুরুইক ও সীমাসাড়ে। এবং শেষ খঁড়টিতে বসবেন তাঁদের গ্রামস্রষ্টা

পূর্বপুরুষ। একই সঙ্গে পূজো পান মানুষ। মানুষ পূজোর এমন আশ্চর্য নজির হিন্দুশাস্ত্রে নেই। পূর্বপুরুষকে দেবতা বলে সাঁওতালরা যেমন মানেন, এমনটি অন্যত্র শোনা যায়নি। লখন-সাধম পূজোর মধ্যে পূর্বপুরুষ ভাবনাটি থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে দীর্ঘদিন পরে তার সঙ্গে মিশে গেছে আরো নানা ভাবনা—উর্বরতা, যাদুবিশ্বাস, এমনি সব। পূজোবিধিরও কমবেশি সংস্কার যে ঘটেনি তাও নয়॥[1]

কালুবীর

'তিনি আমাদের পুরুষ। যুদ্ধে তিনি প্রাণ দিয়েছিলেন। প্রাণ দিয়েছিলেন দেশরক্ষা করতে গিয়েই। সেই জন্যেই তো তাঁর পূজো।' উচ্ছ্বসিত হয়েই বললেন, জাড়া গ্রামের ডোমবৃদ্ধেরা। শুধু জাড়াই নয়, পশ্চিম সীমান্ত বাংলা কিংবা বৃহত্তর রাঢ়ের, যেখানেই এই ডোমদের বসবাস, সেখানেই পূজো পান কালুবীর। কোথাও তাঁর নাম কালুরাজ, কোথাও বীরকালু, কোথাও কালুঠাকুর।

'কালু রায়' নামে রাঢ়ের এক বিখ্যাত গ্রামদেবতা আছেন। তিনি ধর্মঠাকুর। তাঁর থান আছে এই মেদিনীপুরের জাড়া গ্রামে, বর্ধমানের জাড় গ্রামে, হুগলীর ধনেখালির জাড়গ্রামে, বাঁকুড়ার ইন্দাসের করিশুণ্ডা এবং বীরভুমের ইলামবাজারের ঘুরসে গ্রামে। আর কালা রায় ধর্ম আছেন বর্ধমানের জামুরিয়া থানার চিঁচুড়িয়ায়। তিনিও ডোমদের উপাসিত, ডোমেরাই তাঁর পূজারী। কিন্তু আলোচ্য কালুবীর সেই কালু রায় ধর্ম নন। ধর্মপূজোয় আছে বিচিত্র সব ধ্যানধারণা আর বিবিধ সব ধর্মসাধনার সংযোগ। আছে কোলগোষ্ঠীর টোটেমও। কিন্তু কালুবীরের পূজোয় মেশেনি তেমন জটিলতর ধর্মাচরণ। তবে ধর্মঠাকুরের সঙ্গে কালুবীরের যে সম্পর্ক নেই, এমন নয়। ধর্মমঙ্গল কাব্যের নায়ক লাউসেন। কালুবীর সেই লাউসেনেরই প্রধান সেনাপতি। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী পুত্র সকলেই যোদ্ধা। দেশের জন্যে তাঁরা গেছেন যুদ্ধে, শত্রুর বিরুদ্ধে, রাজা লাউসেনের অনুপস্থিতিতে। তাঁরাই করেছেন রাজ্য রক্ষা। যোদ্ধা কিন্তু স্বয়ং ধর্মরাজও। একালে চব্বিশ পরগণার অনেক স্থানে তাঁর এমন মূর্তি নির্মিত হচ্ছে মাটি দিয়ে।

কালুবীরের মূর্তি দেখেছি তিনরকমের। যোদ্ধা মূর্তি দেখেছি বাঁকুড়ার

---

১. সাক্ষাৎকার : শ্রীঅজিত দাশ, (সম্পাদক 'সাম্প্রতিক বাঁকুড়া,'), শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (পূজারী উমাকান্ত শিব), শ্রীমতী গিরি হেমব্রম (৮০), শ্রীমতী চপলা দুলে (৭০), শ্রীমতী চাঁপা হালদার (৬৭), শ্রীদিগম্বর সেন (৮০)। ১১, ৫, ১৯৭৭, ১০, ১০, ১৯৮৯

অম্বিকানগরে। প্রাচীন মল্লরাজাদের খাস রাজধানীতেই। বাঁকুড়া শহর থেকে গোড়াবাড়ি দিয়ে সেখানে যাওয়া যায়। বাস আছে কলকাতা থেকেও। কংসাবতীর তীরে অম্বিকানগর। নদীর তীরেই ধবল-রাজাদের কুলদেবীর প্রাচীন মন্দির। মন্দিরের পাশেই দক্ষিণ দিকে গাছেরতলায় আছে কালুবীরের এই মনুষ্যাকৃতি মূর্তিটি। প্রায় সাড়ে তিনফুট উঁচু। তিনি আছেন হাঁটু মুড়ে। বাঁ হাতে ঢাল, ডান হাতে খোলা তলোয়ার। এ মূর্তি খোদিত এক কালো পাথরের ওপর। গ্রামবাসী একে মেনেছেন 'বীরকালু' বলে। এর পেছনেই আছে আর একটি ছোট্ট মানুষের মূর্তি। তার এক হাতে এক লম্বা লাঠি। ইনি পরিচিত কালুর সহচর বলে। কালুর শিলায় তাঁর মাথার ওপরে আর এক পুরুষ মূর্তি। লোকে বলে, ইনিই সেই লাউসেন। কিন্তু ভ্রমণবিদরা জানেন এমনি খোদিত শিলা আছে বাঁকুড়া মেদিনীপুরের অনেক স্থানে। বাঁকুড়ার পশ্চিমে চণ্ডীদাসের স্মৃতি বিজড়িত ছাতনা, তার কামারকুলিতে আছে এরকম শিলা চারটি। আর একটি আছে ছাতনার পশ্চিমে শুশুনিয়ার পাশে জিড়রা গ্রামে। সেখানে সে শিলাটি পরিচিত গ্রামদেবতা 'খুদ্যানাড়া' নামে। থুমপাথর গ্রামে দুটি শিলাকে পুজো করা হয় 'ভাসুর বুন্নাসিন' বলে। পণ্ডিত যাঁরা, এ বিষয়ে তাঁরা বলেছেন, এ হলো ভুমিজদের স্মৃতিফলক। ছাতনার লোকেরা এগুলিকে বলেছে 'বীরস্তম্ভ'।

কালুবীরের দ্বিতীয় প্রকার মূর্তি অনেকটা মানুষের মাথার মতো। কোনো কোনোটির বুক পেটও স্পষ্ট। যেমন মেদিনীপুর জেলার জাড়া গ্রামে। রামকৃষ্ণ জন্মভুমি কামারপুকুর বা বিদ্যাসাগর স্মৃতি বিজড়িত ক্ষীরপাই থেকে বাসে যেতে হয়। এ গ্রামের প্রাচীন গ্রামদেবতা কালুরায় ধর্ম। খুব প্রাচীন গ্রাম। মাণিক রায়ের ধর্মমঙ্গলে এঁর নাম আছে। গ্রামের পশ্চিমাংশে 'মঙ্গল' পদবীর ব্রাহ্মণদের বাস। এঁদের বাড়ির পাশেই কিছু গাছের তলায় আছেন কালুবীর। এখানে মুণ্ডমূর্তি আছে তিনটি। বাঁকুড়ার দক্ষিণে মটগোদার ধর্মরাজ পেরিয়ে সাতপাটা গ্রাম। খুব প্রাচীন জৈনসংস্কৃতির কেন্দ্র এটি। এমন অসংখ্য জৈন-মূর্তি এখানে সাজানো আছে শীতলা মন্দির। ছড়িয়ে ছিটিয়েও আছে অনেক অনেক মূর্তি। এখানেও কালুবীরের একটি মুণ্ড মূর্তি আছে এক গাছতলায়। ধর্মরাজের গ্রাম মটগোদা। সাতপাটার সাত কি. মি. উত্তরে। মাঘ মাসের শেষ শনিবারে এখানে ধর্মরাজের দশদিন ব্যাপী মেলা। দক্ষিণ বাঁকুড়ায় শ্রেষ্ঠ মেলা এটিই। এ-মন্দিরে থাকেন স্বরুপনারায়ণ, বীজনারায়ণ, ক্ষুদিনারায়ণ, বাঁকুড়া রায় ও বুড়াধর্ম প্রভৃতি ধর্মশিলা। এঁদের মন্দিরের পূর্বে ১ কি. মি. পশ্চিমে ডোমদের বাস। পাশেই প্রাচীন আমবাগান।

এখানেই এক গাছের তলায় পুজো পান কালুবীর। এখানেও আছে তিনটি মুণ্ডশিলা। বাঁকুড়া-মেদিনীপুর সীমান্তে পাথরা এক ছোটো গ্রাম। লুড়কা মৌলাশোল পর্যন্ত বাসে গিয়ে হাঁটা পথ। এখানে ডোমদের পদবী কালিন্দী। মটগোদা ও পাথরার ডোমেরা তৈরি করেন বাঁশের আসবাব ও 'পচা'-পাথরের থালা বাটি প্রদীপ। এঁদের পূজিত কালুবীরেরও মুণ্ডমূর্তি।

কালুবীরের তৃতীয় প্রকার মূর্তির প্রচলন পূর্ব বাঁকুড়ায়, রামসাগর ওন্দা বিষ্ণুপুর ও পাত্রসায়ের অঞ্চলের ডোমপ্রধান গ্রামগুলিতে। ঠিক ভীমের মতো দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে যোদ্ধারূপ। এ মূর্তির সন্ধান দিয়েছেন ডঃ মানিকলাল সিংহ।

তথাকথিত ডোম সম্প্রদায় রাঢ়ের আরেকটি অনুন্নতজাতি। এঁদেরও নানা থাক্। উল্লেখ্য থাক্ আঁকুড়ে, কালিন্দী, মাহিলী, কাটারি, নকুড়ি, ছকুড়ি প্রভৃতি। এঁদের মতে শ্রেষ্ঠ থাক্ আঁকুড়ে। দেবদেবী পুজো করেন তাঁরাই। অনেকেই হাতে রাখেন তামার বালা। পৈতেও রয়েছে অনেকের। এঁরা ডোম-পণ্ডিত। 'পণ্ডিত' এঁদের উপাধি বা পদবীও। এঁদের অনেকেই পুজো করেন ধর্মঠাকুরের। ধর্ম ডোমদের প্রিয়দেবতা। তেমনি প্রিয়দেবতা কালু-বীরও। ঠিক ধর্মের মতো না-হলেও কালুবীরের ওপরে তাঁদের অনেক বিশ্বাস, অনেক ভক্তি। তাঁদের মতে, ধর্মঠাকুর তাঁদের কুলদেবতা, কালুবীর তাঁদের পূর্বপুরুষ। তবে পূর্বপুরুষ এখন পূজিত হচ্ছেন দেবতাজ্ঞানে।

কালুবীরের পুজোবিধি সর্বত্র সমান নয়। নিত্যপুজোর চল্ নেই সর্বত্র। একমাত্র বিষ্ণুপুর অঞ্চলেই কোনো কোনো স্থানে দিন পুজোও হয়। সর্বত্রই তাঁর বার্ষিকী ১৩ বোশেখ। এ দিনটিকেই একসময় ডোমেরা বলতো বছরের প্রথম দিন। অন্য কোনো কোনো সমাজও নববর্ষ ধরতো এ দিনটিকে। অনেকেই করতো 'হালখাতা' ও গণেশ পুজো। এখনো যে কোথাও হয়নি, তা নয়। ভারতীয় জ্যোতিষের পারঙ্গম পণ্ডিত বাঁকুড়ার আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি। তিনি এ নিয়ে ভেবেছেন। বলেছেন, খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে এই ১৩ বোশেখেই ভরণী নক্ষত্রের আদিতে মহাবিষুব হতো। এজন্য এদিনকে গণ্য করা হতো বছরের প্রথম দিন হিসেবে।

পাথরায় পুজো হয় তিনদিন—এখ্যান, শ্রীপঞ্চমী ও জাঁতালের একদিন। প্রধান ভোগ 'কারণ' অর্থাৎ দেশী মদ। এছাড়া দিতে হয় দুধ গুড়। বলি হয় পাঁঠা, মুরগী, হাঁস, কপতা (কপোত)। সেকালে পুজো হত শেওড়া ফুলে। শেওড়া ডাল ছিল তার অন্য একটি উপকরণ। একালেও এসব লাগে। তবে চল্ হয়েছে অন্য সব ফুলের। যেমন চল্ হয়েছে মিষ্টি ও ফলমূল ভোগের। কিন্তু কালুবীরের পুজোর শ্রেষ্ঠ অঙ্গ বাজনা। পুজো আরম্ভের আগেই শুরু হয়

বাজনা। সারাদিন সারারাত বাজনা চলে। একসময় আসর বসত নাচগানের। তৈরী হত থানের দুদিকের দুটো বাঁশের ফটক। ভোগ সাজানো হত বাঁশের ডালিতে। পুজো করতেন ডোম পণ্ডিত বাঁশের আসনে বসে। এখন মন্ত্র হয়েছে। এ পুজোর বীজমন্ত্র ধাং ধুং ধৈং ধঃ। এখনও অনেক স্থানেই পুজোতে হয় খিচুড়ি ভোগ। স্থানে স্থানে হয় বালক ভোজন কিংবা নরনারায়ণ সেবা। সব জাতির লোকেরাই সেখানে পাতা পান। ডোমেদের পুজো কিন্তু সাহায্য করেন সারা গ্রামবাসীই। চালডাল আনাজ পয়সাকড়ি দেন অনেকেই।

ডোমেদের এদিন পালিত হয় একটি চমৎকার সংস্কার। যে শেওড়া ফুলে কালুবীরের পুজো, সেই শেওড়ার একটা করে ডাল তাঁরা গুঁজে দেন নিজ নিজ বাড়ির ঈশানকোণে। তাঁদের বিশ্বাস, বজ্রপাত হবে না এ ডাল রাখলে। ঘরের চাল (খড়ের ছাউনি) উড়াবে না কালবৈশাখী। এ রীতিটি এখন মানেন গ্রামের অনেক মানুষই। অনেক ব্রাহ্মণ পরিবারও এদিন ঘরের ঈশান কোণে গুঁজে দেন শেওড়া ডাল।

১৩ বৈশাখ বড়ো পবিত্র দিন ডোম সমাজে। বীরভুমের অজয় নদীর দক্ষিণে আছে ইছাই ঘোষের দেউল। দেউলের নিকটেই আছে 'লাউসেনতলা'। সেখানের এক প্রাচীন পুকুরের নাম 'লাউসেন কুণ্ড'। প্রকাণ্ড সেই পুকুর নিয়ে গল্প আছে প্রচুর। এদিন এ পুকুরে ডোমেরা তর্পণ করেন কালুবীরের নামে। জমাটী উৎসব হয়। জমাটী উৎসব হোত মেদিনীপুরের জাড়া গ্রামেও। এখনও তেমন ব্যক্তি বেঁচে আছেন, যিনি বাল্যে দেখেছেন সেই উৎসব। দূর দূরান্তরের ডোমেরা সপরিবারে আসতেন জাড়ায়। সারাদিন ধরে চলতো নাচ গান আনন্দ। খাওয়া দাওয়া চলতো মাংস ভাত। খিচুড়ি পেতেন যেকোনা আগন্তুক। নাচগান চলতো সারারাত। যুদ্ধের সাজ পরে অভিনয় দেখাতেন ডোম ছোকরারা। তখন পুজো হতো দুদিন ধরে। কখনো-সখনো ধর্মমঙ্গল গান গাওয়াতেন দল আনিয়ে। এখন পুজো হয় নামমাত্র। ডোমেদের এখন করুণ অবস্থা। এখন হৈহুল্লোড় কমে গেছে একেবারেই। এখন পুজোয় লোক আসেন না। কেউ কেউ আসেন দূর থেকে, সে শুধু চর্মরোগের ওষুধ নিতে।[১]

ডোমদের দাবী, কালুবীর তাঁদের পূর্বপুরুষ। তিনি ছাপোষা মানুষ, কিন্তু বীরযোদ্ধা। তিনি তীরন্দাজ ও দেশপ্রেমিক। ডোম সমাজের শ্রেষ্ঠ বীর তিনি।

১. জাড়া গ্রামনিবাসিনী শ্রীমতী শান্তিবালা ঘোষ প্রমুখ গ্রামবৃদ্ধাদের বক্তব্য। সাক্ষাৎকার ৪, ১, ১৯৭৮। এসময় উপস্থিত ছিলেন পুজারী ও স্থানীয় ডোম বৃদ্ধবৃদ্ধারা। ছিলেন গবেষক রোহিনী মঙ্গল, জগদীশ রানা এম, এ., কাঞ্চন সরকার বি, এড্., হরপ্রসাদ রায় এম এ.—চার শিক্ষক।

অষ্টাদশ শতকে রচিত হয়েছিল কিছু ধর্মমঙ্গল কাব্য। ধর্মঠাকুরের পুজো মাহাত্ম্য নিয়ে যেসব কাব্য। সে-কাব্যের একটি বিখ্যাত চরিত্র ডোম সৈনিক কালু। লাউসেন সে-কাব্যের নায়ক। তিনি গেছেন হাকন্দ তপস্যায়। কালুকে দিয়ে গেছেন রাজ্যরক্ষার দায়িত্ব। খলনায়ক মহামদ। সে রাজ্য আক্রমণ করলে লাউসেন অনুপস্থিত জেনে। কালুর পত্নী লখাই স্নানকালে দেখলেন সৈন্যসজ্জা। ছুটে এসে যুদ্ধে যেতে বললেন স্বামীকে। কিন্তু কালু তখন মদে আচ্ছন্ন। বহু কথার পর যুদ্ধে গেলেন কালুপুত্র শাখা। মহামদকে হারিয়ে দিলেন তৎক্ষণাৎ। সানন্দেই ফিরছিলেন বাড়ি। পথে জলপান করতে নামলেন নদীতে। অতর্কিতে তাঁকে হত্যা করল মহামদের গুপ্তচর। খবর শুনে ক্ষীপ্ত হলেন কালুবীর। মহামদকে তিনি সম্পূর্ণ হারিয়ে দিয়ে দূর করে দিলেন দেশ থেকে। স্থানীয় ডোমরা ধর্মমঙ্গল কাব্য জানেন না। তবে তাঁদের মুখের কাহিনীর সাথে যোগ পাই কাব্যের কালুবীরের কথায়। এদেশে যে ডোমরা একসময় সৈন্যসজ্জা করতেন, তাঁরা যে বীর জাতি, একথা জানেন পণ্ডিত মাত্রেই। 'আগডোম বাগডোম ঘোড়াডোম সাজে' ছড়াটি বহন করছে তারই প্রাচীন সাক্ষ্য। বিষ্ণুপুর-অম্বিকানগর-শ্যামসুন্দরপুর-কুচিয়াকোল-সিমলাপাল প্রভৃতি স্থানের জমিদার বা রাজাদের সৈন্যবিভাগে বহু ডোম সৈন্যই প্রধান হয়ে উঠেছিলেন, এ তথ্যও পাই ছাতনার বর্তমান মহারাজার কথাবার্তায়। সুতরাং ধর্মমঙ্গলকাব্যের কালুডোম ঐতিহাসিক কালুবীর হতে বাধা নেই কোথাও। তবে কালু নামক একজন বীর ডোম সৈনিক বর্তমান ছিলেন, তা অস্বীকার করা যাচ্ছে না কিছুতে। কালুবীর পুজো জড়িয়ে আছে সেই কালুবীরের সঙ্গেই। ডঃ মাণিকলাল সিংহও বলেছেন : "খুব সম্ভব মহাপদ্ম নন্দের কলিঙ্গ অভিযানের সময় (খ্রীঃ ৪র্থ শতাব্দী) এই অঞ্চলের (রাঢ়) লোকেরা তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করিয়াছিল। আঁকুড়ে ডোমদের পূর্বপুরুষ কালুবীর এই যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দেন। সেই পুণ্যস্মৃতি আজও তাঁহারা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।"[২]

ধর্মমঙ্গলকাব্যের যে যোদ্ধা বীরকালু, তাঁর সঙ্গে লোকদেবতা কালুবীরের সম্পর্ক থাকাটা আশ্চর্য নয়। তবে সাধারণ ডোম সমাজ ঔৎসুক্য দেখান নি সে বিষয়ে। পরিচয় করিয়ে দিলে, তারা দাবী করেন ধর্মমঙ্গল কাব্যেই ছায়া ফেলেছেন তাঁদের পূর্বপুরুষ কালুবীর। তাঁরা বলেন, পুরুষে পুরুষে তাঁরা তাঁকে পূর্বপুরুষ বলেই জেনেছেন বাপঠাকুর্দার মুখ থেকে।

---

২. রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি, ১ম (১৩৮৮) পৃ ১৬৮

কালুবুড়িঃ প্রসঙ্গত বলতে হয় কালুবুড়ি পুজোর কথাও। এই নামে গ্রাম্যদেবী আছেন বাঁকুড়ার কিছু গ্রামে। তাঁর খুব বিখ্যাত থান বাঁকুড়ার ছান্দার ও অযোধ্যা গ্রামে। বাঁকুড়া-সোনামুখী-বর্ধমান বাসে ছান্দারে যাওয়া যায়। অযোধ্যা গ্রামে যাওয়া যায় বিষ্ণুপুর রামসাগর থেকে অহল্যাবাই রোড দিয়ে। দুই স্থানেই তাঁর পুজো হয় দশহরায় ও মনসা পুজোর দিনে, মনসার সঙ্গেই, মনসার মন্ত্রেই। কেউ কেউ এঁকে অন্বিত করেছেন মানুষ পুজোর সঙ্গে। ডঃ মাণিকলাল সিংহ বলেছেন ঃ "কালুবুড়ি খুব সম্ভব রাঢ়ের বীরযোদ্ধা কালুবীরের সহধর্মিণী ছিলেন। সর্প বিদ্যায় পারদর্শিনী এই সিদ্ধারমণী কালুবুড়ি মৃত্যুর পর সর্প দেবীতে পরিণত হইয়াছেন।…"রাঢ়ের আঁকুড়ে ডোমগণ তাঁহাদের স্বজাতীয় সিদ্ধারমণী কালুবুড়ি কাল্টের প্রবর্তক।"[1] কিন্তু উল্লিখিত কালুবুড়ি নাম্নী দুস্থানের দুই দেবীর সম্পর্কে মেলেনি তেমন কোনো প্রবাদ। ধর্মমঙ্গলকাব্যে কালু ডোমের পত্নীর নাম লখাই ডোমনি, কালুবুড়ি নয়। তবে তিনি বীরাঙ্গনা, বীররমণী সুনিশ্চিত। তিনিই স্বামীকে যুদ্ধে যেতে বলেছেন মহামদের বিরুদ্ধে। স্বামী না যেতে, যেতে বলেছেন পুত্রকে। রাজি হয় নি পুত্র। লখাই ধিক্কার দেন তাঁকে ঃ "মোর দুগ্ধ খেয়ে বেটা রণে ভীত হলি। তু বেটা তখনি কেনে হয়ে না মরিলি।" আশ্চর্য নয় কি ? স্বামী পুত্রের ব্যবহারে কাঁদতে বসলেন তিনি। বিষয়টি বুঝলেন তাঁর পুত্রবধূ ময়ুরা। ময়ুরা স্বামী শাকাকে ভৎর্সনা করলেন ঃ "তুমি কৈলে কি। দেশের বিপত্তি এই শ্বশুরের সেই॥ শাশুড়ি বিকল কাঁদে শত্রু দেশ লেই॥ মহাগুরু বচন রাজার নুন খেলে। পাতক সঞ্চয় কেন কর বুক হেলে॥ জগতে জাগাবে যশ যদি জিন যেয়ে। মরত মুকুন্দ পাবে মুক্তিপদ পেয়ে॥" উপযুক্ত শাশুড়ির উপযুক্ত পুত্রবধূ ময়ুরা। বীরাঙ্গনা তাঁদের বলবো না তো বলবো কাদের ? ডোম জাতি ভিন্ননামেই এঁদের জানেন। সমগ্র বিষ্ণুপুর অঞ্চলে কালুবুড়ি, লখাই নয়। এ নিয়ে গল্প আছে নানাবিধ। লখাই মায়া জানতেন। তাঁর দিদিমা ছিলেন কামরূপ কামাখ্যায় সিদ্ধা। লোকে তাঁকে বলতো 'ডাকিনী'। লখাই মায়াবিদ্যা (অলৌকিক বিদ্যা) শিখেছিলেন তাঁরই কাছে। সেকালে সিদ্ধারমণী মাত্রই পুজো পেতেন ভীতসন্ত্রস্ত মানুষের কাছে। এখনো গ্রামের সাধারণ মানুষ জন ডাইনী ও গুণীণ রমণীদের সমীহ করে চলেন পারিবারিক অকল্যাণের ভয়ে। বৌদ্ধদের ইতিহাসেও তেমন সিদ্ধাদের বহুমান্যতা ছিল। এ সব থেকে মনে হচ্ছে কালুবুড়ির পুজোও এসেছে এমনি এক অবস্থা থেকে। তিনি ক্রমে

---

১. রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি, ১ম (১৩৮৮) খণ্ড, ১৬৮, ১৬৯

পর্যবসিত হয়েছেন সর্পবিদ্যার অধিশ্বরী থেকে সর্পদেবীতে। পরবর্তীকালে তাঁর মধ্যে মিশেছে আরো নানা লোকবিশ্বাস স্বাভাবিকভাবেই।

সুতরাং কালুবীর বা কালুবুড়ি উপাসনায় বীরপুরুষ বা বীরনারী পুজোয় আদিম লক্ষণ বড়ো রহস্যাবৃত। তাহলেও তাকে অস্বীকার করা যায় না॥

কুড়ু খাঁ

মেদিনীপুর জেলার ছোটো গ্রাম ঘোলা। রামকৃষ্ণদেবের জন্মভূমি কামারপুকুর থেকে বাসে রামজীবনপুর কিংবা শ্রীনগর। সেখান থেকে হাঁটাপথে ঘোলা। চারদিকে সব প্রাচীন সংস্কৃতির লোকালয়। উত্তরে হুগলী জেলার সীমান্তে বিখ্যাত গড়মান্দারণ। এখন তা এক বিরাট ধ্বংসস্তুপ। সেখানে গাজীসাহেবদের বড় আস্তানা ও ছোটো আস্তানার মতো প্রাচীন সমাধি। এখনো সেখানে দেখার আছে অনেক কিছুই। দক্ষিণে সারিবন্ধ সব প্রাচীন গ্রাম রামজীবনপুর, শ্রীনগর, পরমানন্দপুর, তাতারপুর। প্রাচীন মন্দির, মন্দির ভাস্কর্য, গ্রাম্য দেবদেবী নিয়ে এদের এখনো তেমনি গৌরব। পরমানন্দপুরে আছেন রঙ্কিনী, তাতারপুরে বিশালাক্ষী, শ্রীনগরে রাধাগোবিন্দজীউ। সেইসব সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে ঘোলা গ্রামও বর্তমান, তার ততোধিক বিচিত্র গ্রামদেবতা কুড়ু খাঁকে নিয়ে। নামে পুজোরীতি ও লোকবিশ্বাসে যিনি আশ্চর্য করেন আমাদের।

বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম। প্রধান ৫টি পাড়া। প্রধান বাসিন্দা সদ্‌গোপ আর বাগদি। গ্রামে থান আছে নানা দেবদেবীর। যেমন মনসা, শীতলা, কালী, রাধাগোবিন্দ প্রভৃতি। প্রচলিত বিশ্বাসে এঁরা সব হিন্দুর দেবদেবী। বোশেখে হয় শীতলা পুজো। রাধাগোবিন্দের নামযজ্ঞ মহোৎসব হয় আষাঢ়ে। শ্রাবণে হয় বাউরিদের মনসাপুজো। কালী, সরস্বতী, লক্ষ্মী ইত্যাদির পুজো তো আছেই। এ-সবের সঙ্গে আছে কুড়ু খাঁর পুজোবার্ষিকী, তা হয় মকর সংক্রান্তিতে।

গ্রামের মাঝখানে কুড়ুখাঁর থান। সেটি মন্ডলদের বাড়ির পাশেই, গ্রামের মধ্যে একফালি রাস্তার ওপর। থানে দুটি শেওড়া গাছ। সামান্য একটু জমি তাঁর এলাকা। সামান্য একটু উঁচু স্থান। তাতে ৫টি ধাপ। সর্বোচ্চ ধাপে আছেন কুড়ু খাঁ। তাঁর প্রতীক হলো পোড়ামাটির ঘোড়া। থানের একেবারে দক্ষিণে আছে একটি লাগাম আঁটা ছুটন্ত ঘোড়া। উচ্চতায় চার ফুট। আর ২০টি ঘোড়া আছে দু তিন ফুটের। তবে গণনাতীত ঘোড়া আছে

থানের চারদিকেই। সেগুলি এখন থানে রাখা যাচ্ছে না। তাই রাখা হয়েছে পাশের একটি পোড়ো ঘরে। ছেলেরা কিছু তুলে দিয়েছে গাছের ডালে। কিন্তু লক্ষণীয় যে, থানে হাতি নেই একটিও। এদেশে খুব কমই গ্রামদেবদেবী আছেন, যাঁদের প্রতীকে হাতি থাকে না।

কুড়ু খাঁর নিত্যপুজো। নিত্যপুজো করেন 'হড়' পদবীর ব্রাহ্মণেরা।[১] তাঁরা পাশের গ্রাম নারায়ণপুরের অধিবাসী। কিন্তু বার্ষিকীতে পুজো করেন জাড়া গ্রামের 'মঙ্গল' পদবীর ব্রাহ্মণেরা। রাঢ়ী ব্রাহ্মণ বলেই এঁদের দাবী।[২] এদেশের সকল উচ্চ পদবীর ব্রাহ্মণদের সঙ্গেই এঁদের বৈবাহিক আদানপ্রদান।

কুড়ু খাঁ গ্রামদেবতা। সর্বসাধারণের দেবতা তিনি। পুজো দিতে আসেন হিন্দু মুসলমান সকলেই। ঘোলায় প্রতিটি ঘর এঁর পুজার্থী। বার্ষিকীতে আসেন দূরদূরান্তের লোকজন। মানসিক করেন তাঁরাও। তবে পুজো দিতে শুনিনি কোনো সাঁওতালকে। নিকটে সাঁওতাল সম্প্রদায় না-থাকাটাও তার কারণ। কুড়ু খাঁর পুজো-মন্ত্র আছে। সত্যনারায়ণের ধ্যানে তিনি পুজিত : 'ওঁ ধায়েৎ সত্যং গুণাতীতং গুণত্রয় সমন্বিতম্। লোকনাথং ত্রিলোকেশং-পীতাম্বরং হরিম্ ॥' সঙ্গত সব কারণে, এখন পুজোআজা কমছে দে-দেবতার। কুড়ু খাঁর পুজোতেও তার প্রভাব পড়েছে। এখন যাত্রী না-এলে পুজো হয় না তাঁর। তবে সংক্রাতিতে পুজো হবেই। দিনের প্রথম দিকেই পুজো। নৈবেদ্য লাগে আলোচাল, রম্ভা ও পাটিগুড়। মানসিক থাকলে লোকে দেন তার সঙ্গে সিন্নির উপকরণ ও মাটির ঘোড়া। পৌষ সংক্রান্তিতে তাঁর বার্ষিকী পুজো। পরব জমে ওঠে এদিন। লোক আসেন নানা গ্রাম থেকে। পুজার্থীরা ভীড় করেন প্রায় সকাল থেকেই। রাঢ়ের সর্বত্র এদিন তুষু-ভাসানের উৎসব। তুষু খোলা বা তুষু মূর্তি এদিন ভাসানো হয় গান করে, নাচ করে, কখনো বা বাজনা বাজিয়ে। দলে দলে আসেন ব্রতিনীরা কুড়ু খাঁর থানের পাশে 'পাবদা' পুকুরে। নানা বয়েসী নারীর জমায়েৎ ঘটে থানের চারদিকে। জাড়ার 'মঙ্গল' পদবীর ব্রাহ্মণ পুজোয় বসেন সকাল সকাল। 'মকর ভোগ' হয় ঠাকুরের। কাঁচা দুধে আলোচালের গুঁড়ি, আখকুচি, ফলকুচি মিশিয়ে তৈরি হয় গামলা গামলা মকর ভোগ। গুড়ের সিন্নি হয় বড় বড় সব পাত্রে। গ্রামবাসী বলেন, কিছুদিন আগেও সিন্নি হতো চার পাঁচ মণ গুড়ের। এখনো হয় এক কুইন্টল গুড়ের সিন্নি। গুড় দেন গ্রামের প্রতিটি পরিবারই। এজন্যে দরকার হয় না

১. শ্রীসত্যকিংকর হড় (৩৪), শ্রীরামকৃষ্ণ হড় (২৯)—সক্ষাৎকার ১০. ৪. ১৯৮০
২. শ্রীরামগতি মণ্ডল (৫৭)

মানসিকের। মানসিকী ভক্তরা দেন পাকাসিন্নি। সেকালে ছিল এ নিয়ে চমৎকার এক রীতি। রোগ সেরেছে যাঁর, তিনি দেবেন তেমনি সিন্নি, যতটা তিনি পারবেন বইতে। তা তিরিশ বা পঞ্চাশ কেজিও হতে পারে। পুজোর শেষে মকর ভোগ বা সিন্নি দেওয়া হয় উপস্থিত সকলকে।

ঘোলা অঞ্চলের মানুষের গভীর বিশ্বাস কুড়ু খাঁর ওপরে। যেন অন্ধবিশ্বাস। লোকে বলেন, তাঁর নামেই আছে মাহাত্ম্য। শুধু নামটা স্মরণ করলেই সাফল্য নিশ্চিত। ক্ষেপারোগ বা মাথাগরম সেরে যায় তাঁর ওষুধে। বিছানা-পেচ্ছাব (শয্যামূত্র) উপশমের জন্যেই তিনি প্রসিদ্ধ। গরুবাছুরের পা ভেঙে গেলে, হাড় সরে গেলে তাঁর থানের মাটি লাগাতে হয় ক্ষতস্থানে। পশুদের নানা রোগেও লোকে মানসিক করেন তাঁকে। সাংসারিক শান্তির জন্যে মানসিক করেন সিন্নি। গর্ভবতীরা তাঁর কবচ পরেন গর্ভস্থ সন্তানকে রক্ষা করার জন্যে। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রথম সন্তান মারা গেলে, কবচ নিতে হয় ন-মাসেই। প্রসব যন্ত্রণা উঠলেই খুলে দিতে হয় সে কবচ। নবজাতকের বিছানায় রাখতে হয় সেটি। পরে সেটি পরিয়ে দিতে হয় তার গলায়। তার গলায় সেটি থাকবে এক বছর পর্যন্ত। লোকের বিশ্বাস, এ হলো রক্ষা কবচ, যম লাগবে না, ভূত লাগবে না।

গ্রামের প্রধান জাতি সদ্‌গোপ। তাঁরা কুড়ুখাঁকে মানেন পারিবারিক দেবতা বলে। তাঁদের বিশ্বাস, রাত্রে তিনি পাহারা দেন তাঁদের বাড়িগুলি। এজন্যে নিষেধ আছে সদ্‌গোপদের সদরে দরজা বসানোর। তাঁদের দাবী, এ পর্যন্ত চুরি হয়নি তাঁদের পাড়ায়। এ নিয়ে গল্প আছে নানাবিধ। চোরকে অন্ধ করে বসিয়ে রাখা, বাগালবেশে কুড়ু খাঁর গরু চরানো—এমনি সব গল্প।

কে এই কুড়ু খাঁ? কেউ বলেন পীর, কেউ বলেন জনৈক মুসলমান সৈন্য। থানটা একটা সমাধি-ক্ষেত্র। সেই পীরের কিংবা সৈন্যের সমাধি। পণ্ডিতেরা এগিয়ে এসে বলবেন, ভাষাতত্ত্বের কিছু তথ্য। সংস্কৃত কুল্য, প্রাকৃত কুড্য, প্রাচীন বাংলা কুড়, আদরার্থে উ, কুড়ু। কুল্য মানে সৎকুলজাত বা সাধু-পুরুষ। খাঁ বা খান্ উপাধি বিশেষ। এ উপাধি দেবার চল্ ছিল পাঠান-রাজাদের সময়ে। হিন্দু মসুলমান, যে কেউ পেতে পারতেন। হিন্দু যাঁরা, সেনাপতি হতেন গৌড়দরবারে, তাঁদের খাঁ বলা হয়েছে। কিন্তু জনহিতকর কাজ করলেও খাঁ উপাধি পেতেন সে সময়ে অনেকে।[১] খাঁ খেতাব ছিল মোগল আমলেও। অর্থাৎ কুড়ুখাঁকে তাঁরা বলতে চান জনৈক সাধু ব্যক্তি, যিনি হিন্দু-

১. পঞ্চদশ শতকে বর্ধমান কুলীনগ্রামের কবি মালাধর বসুও গৌড়েশ্বরের কাছে 'খাঁ' উপাধি পেয়েছিলেন—গৌড়েশ্বর নাম দিলা গুণরাজ খান'।

সন্ন্যাসী বা মুসলমান ফকির। অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন তিনি। সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন লোকহিতৈষী বলেই। তাঁর মৃত্যুর পর, লোকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছিলেন তাঁর সমাধির ওপর। তাঁর কুটিরটি ছিল বর্তমান থানে। দৈব-বিশ্বাসীর দেশে, সেই ব্যক্তিই ক্রমে ক্রমে পরিণত হয়েছেন দেবতায়। তবে তিনি কোবরেজি যে করতেন তা স্পষ্ট লোকবিশ্বাসে, ওষুধ গ্রহণে। সেকালে কেন, একালেও পশুচিকিৎসা, সন্তানাদি বিষয়ক নারী চিকিৎসায় এমন কোবরেজ বা হাতুড়ের অভাব নেই গ্রামে গঞ্জে। এবং সাধুসন্ন্যাসী, বিশেষ তিনি যদি অলৌকিক শক্তিধর হন, তাঁকে মানতো বা ভয় করতো চোর ডাকাতও। সম্ভবত সেকারণেই তাঁর পাড়ায় অর্থাৎ সদগোপদের পাড়ায় চুরি ডাকাতি হতো না কখনো।

কুড়ুখাঁর প্রধান মানত সিন্নি। পুজোর মন্ত্রও সত্যনারায়ণের। এ থেকে মুসলিম ধর্মধারার সঙ্গেই তাঁকে সংযুক্ত করতে হয়। সেকালে ঘোলা মান্দারণ প্রভৃতি অঞ্চলে গাজি পীর ফকিরদের বসবাস ও যাতায়াতের সংবাদ ও ঐতিহ্য আছে বিবিধ। মুসলমান যুগ থেকেই এঁদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এ অঞ্চলের সামগ্রিক সংস্কৃতি। মুসলমানের সত্যপীর হয়েছেন সত্যনারায়ণ। নারায়ণ মানে বিষ্ণু। কুড়ুখাঁও তেমনি মুসলমান ফকির থাকা স্বাভাবিক। হিন্দুদের পরম শ্রদ্ধায় তিনি হয়ে উঠেছেন হিন্দুর পুজনীয় দেবতা। গ্রামে মুসলমান না-থাকায় তিনি পরে আর মিশতে পারেন নি মুসলিম সংস্কৃতির সঙ্গে। মুসলমান পীরের কবরস্থানে পুজো দেওয়ার রীতি আছে সারাদেশেই। রূপ-রাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গলে এমনি সব পীর গাজিদের বন্দনা আছে : 'মান্দারণ গড়ে বন্দি পীর ইসমাইলি। বন্দিব বড়গাঁ গাজি রিসিবাটি গাঁ। নিজবাটি বন্দিব পেঁড়োর শুভি খাঁ। ত্রিপর্ণির বন্দো দফর খাঁ গাজি।···পীর পাখাম্বর বন্দো আছে যতগুলি॥" শুভি খাঁ পীরের বন্দনা করেছেন মুকুন্দ চক্রবর্তীও—'পাজো-য়ায় বন্দিয়া যাবো শুভি খাঁ পীরে।' ঠিক শুভিখাঁর মতোই কুড়ুখাঁও ছিলেন মুসলিম ফকির। সুতরাং কুড়ুখাঁ পুজো পূর্বপুরুষ পুজোর নিশ্চিত নিদর্শন। তবে কালে কালে তাঁর উপাসনায় মিশে গেছে নানা যাদুবিশ্বাস, এমন কি সন্তান বিষয়ক উর্বরতাবাদও॥

পুটু বুড়া

গ্রাম পরিক্রমায় অবাক হচ্ছি দিন দিন। যতই ঘুরছি, ততই দেখছি বিচিত্র সব মানুষ, মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতি। পুরোনো নতুন মিলিয়ে মানব সভ্যতা সত্যি অভিনব। মেদিনীপুর জেলায় শালবনী থানার ছোট্ট একটি গ্রাম গোদা-

মৌলী। একান্তই সাঁওতাল পল্লী। নিতান্ত জনমজুরের গ্রাম। কলকাতা রোড-চন্দ্রকোণা-সারেঙ্গা গামী সরকারী বাসে নামতে হবে গোয়ালতোড়ে। সেখান থেকে দক্ষিণে আট কি. মি. দূরে গোদামৌলী। গ্রামদেবতার নাম 'পুটুবুড়া'। 'বুড়া' শব্দ তো শুনি মানুষের ক্ষেত্রে। বুড়া, সংস্কৃত বৃদ্ধ শব্দের লৌকিক রূপ, মানে বয়স্ক। তবে গ্রামজনেরা আদর করে শিশুদের ডাকেন বুড়া বা বুড়ন বলে। সেখানে কামনা লুকিয়ে থাকে, শিশুটি জীবিত থাকবে, বুড়ো হবে একদিন। 'পুটু' শব্দও শুনেছি। তার মানে ছোটো বা ক্ষুদ্র। গ্রামাঞ্চলে ছোটো ছেলেদের বলে পুটু, পুট্যা, পুটকা। বাচ্চা মেয়েকে বলে পুটি, পুটকি। অন্তত গোয়ালতোড়: সারেঙ্গা ঝাড়গ্রাম রাইপুর সিমলাপাল খাতড়া অঞ্চলে এ সব শব্দের প্রচণ্ড চল্। এ· ডাকটিও আদরের। এ দেশে এক রকমের ছোটো মাছকেও বলে পুঁটি মাছ। কাতলা রুই মিড়িক প্রভৃতি বড়ো মাছের অবিকল আকারের ছোটো মাছ হলো·পুঁটি মাছ। অর্থাৎ পুটু মানে ক্ষুদ্র, বুড়ো মানে বৃদ্ধ। গ্রামদেবতার নামটি এই দুই শব্দ মিলিয়ে। আশ্চর্যই বটে।

গ্রামের এক বাঁশবাগানের মাঝে পুটুবুড়ার থান। কোনো মূর্তি তাঁর নেই। তাঁর প্রতীক আছে কয়েক হাজার নতুন পুরোনো আস্তভাঙা হাতি ঘোড়া। পশ্চিমদিকে মুখ করে তিনি বর্তমান। পুজো পান না প্রতিদিন। পুজো পান সারা বছরে একদিন—৭ মাঘ। পাশাপাশি আর সব গ্রামদেবতাদের পুজো ১, ২ বা ৩ মাঘ। সেজন্যে এ দেবতার পুজোর দিন ৭—মাঘ হতে পারে। কিংবা সংস্কারও থাকতে পারে ৭ মাঘ নিয়ে। কিন্তু জানা যায়নি সে রকম কিছু। এ দিন তাঁর সাড়ম্বরে পুজো অন্য সব দেবতার ঠিক বার্ষিকী পুজোর মতোই। শুধু নামটি নয়, তাঁর নৈবেদ্যটিও ব্যতিক্রম উদাহরণ। তা হলো নুন (লবণ)। এদেশে আর কোথাও কোনো দেবদেবীর পুজোর নৈবেদ্য নুন নয়। নুন ছাড়া আর কিছু ভোগ দেওয়া চলে না তাঁকে। এবং মিষ্টি, দুধ গুড়, নিষিদ্ধ সবই। কারণ জানেন না গ্রামবাসী বা পুজারী কেউই। এক গ্রামবৃদ্ধ বলেছিলেন, তিনি ওষুধ দিতেন যা, তা নুন ছাড়া আর কিছু নয়। সব রোগেই তিনি দিতেন 'নুনপড়া'। পুজো করেন গ্রামেরই জনৈক সাঁওতাল, 'সরেণ' তাঁর পদবী।[১] পুরুষানুক্রমে তাঁরাই করে আসছেন পুজো। তবে পুজো দিতে আসে গ্রামের সাঁওতাল ছাড়াও মাহাতো মাঝি বৈষ্ণব এবং অন্যান্য গ্রামের প্রায় সব জাতির লোক। ৭ মাঘ মেলা বসে যায় দুপুর থেকেই। দোকানপাট, আত্মীয় স্বজন, লোকজন, বিচিত্র সব নাচগান বাজনা, মুরগী লড়াই, সব মিলিয়ে গোদামৌলীর গ্রামজীবনের

---

১. শ্রীমঙ্গলাই সরেণ (৬)।

চেহারা পাল্টে যায় ভীষণভাবে। গ্রামের লোকসংখ্যা পাঁচশোর বেশি নয়, কিন্তু সন্ধ্যায় গ্রামে ওঠে কলকল ধ্বনি।

পুটুবুড়ার ওপরে গ্রামবাসীর বিশ্বাস গভীর। লোকের ধারণা, তিনি গরু-বাছুরের রোগ সারান সব রকমের। তাদের রোগে লোকে তাঁর নামে মানসিক করেন নুন (লবন)। সন্নিপান, পেটটান, পেটফাঁপা, খুরের ঘা, চামড়ার ঘা, আরো সব বিচিত্র রোগ হয় গরুর। তখন গরুর মালিক পুজারীর বাড়িতে হাজির হন নির্দিষ্ট কিছু পরিমাণ নুন নিয়ে। পুজারী তা করে দেন মন্ত্রপুত। নির্দিষ্ট নিয়মে তা খাওয়াতে বলেন রোগী-পশুকে। রোগ সারলে ঠাকুরের নামে দিতে হয় আরো পাঁচ সিকের (১২৫ পয়সার) নুন। পুজোর দিনে কাতারে কাতারে মানুষ থানে হাজির হন শালপাতার ডোংলায় নুন নিয়ে। পাহাড় জমে যায় নুনের। সারা বছরেও পুজারীরা শেষ করতে পারেন না সে নুন। বিক্রীকরে দেন অধিকাংশটাই। এ জাতীয় নুন প্রদানের উৎসব এদেশের আর কোথাও নেই। পুজোর কোনো মন্ত্র নেই। পুজো চলছে ভক্তি ও বিশ্বাসের জোরে। নামে ও পুজোচারে এ-দেবতার অভিনবত্ব বড় প্রকট।

পুজারীরা দাবী করেন পুটুবুড়া তাদের পূর্বপুরুষ। জনশ্রুতিও সমর্থন করে তাকে। বর্তমান যে পুজারী, তাঁর মতে, পুটুবুড়া তাঁর ঊর্ধ্ব পক্ষে দশম-পুরুষ। পুটুর চার ছেলে, একজনের নাম বিদ্যা। বিদ্যার বংশধরেরা ছড়িয়ে আছেন নানাস্থানেই। বিদ্যার দুই ছেলে, ছোটছেলে লুদু। পুজারী বলেন, তাঁরা সেই লুদুর বংশধর। অন্তত ২৫ বছরে একপুরুষ ধরলে পুটুর জীবৎকাল দাঁড়ায় অন্তত ২৫০ বছর আগে। অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি জীবিত ছিলেন পুটু। গ্রামবাসী একজোটে বলেন, নিতান্ত গ্রামের মানুষ পুটু, গরুচরানোই ছিল তাঁর পেশা। তবে তাঁর বুদ্ধি ছিল প্রখর। সরে যাওয়া হাড় বসিয়ে দিতে পারতেন কৌশলে। জানতেন তুকতাক ঝাড়ফুঁকও। পল্লীগ্রামের লোকায়ত বিশ্বাসে এখনো সগৌরবে বিদ্যমান নানা যাদুবিদ্যা। ধুলোপড়া, বালিপড়া, জলপড়া, তেলপড়া, শর্ষেপড়া, হলুদপড়ার মতোই নুনপড়া। পেটের নানা ব্যথায়, পেট ফাঁপায়, কিংবা গ্রহণী-রোগে সেকালে দেওয়া হতো নুনপড়া। মুখে জল উঠলেও তা দেওয়ার চল্ আছে। নুনপড়ারও নিয়ম আছে বিচিত্র। পুটু-বুড়া এসব কাজে ছিলেন বড়ো ওস্তাদ। তাঁর তেলপড়া ও হলুদপড়া ছিল চর্মরোগের সবচেয়ে বড় ওষুধ। জীবৎকালে পুটুবুড়া এসব করে সম্মান পেয়েছিলেন খুব। মৃত্যুর পরে তার জন্য তিনি পুজিত হয়েছেন দেবতারূপে।

সাঁওতালেরা জাহের থানে পুজোকরেন পূর্বপুরুষের। তিনি যদি গ্রামস্রষ্টা হন, তাহলে তাঁর পুজো অবধারিত। এ জন্যে তাঁদের পুজোয় পূর্বপুরুষের জন্য

নির্দিষ্ট আছে একটি করে খঁড়। পুটুবুড়া লোকঐতিহ্য অনুসারে গ্রাম-স্রষ্টাও। সুতরাং গ্রামদেবতা পুটুবুড়ার পুজোয় মানুষ পুজোরই জড় বর্তমান॥

মাঝিবুড়া

'বুড়া' আন্তিক আর এক সাঁওতালী দেবতা হলেন মাঝিবুড়া। তিনি দুবরাজপুর গ্রামের সাঁওতালী দেবতা। বাঁকুড়া জেলার সিমলাপাল থানার এটি একটি বৃহৎ গ্রাম। কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থা বড়ো করুণ। গ্রীষ্মকালে একটি মাত্র বাস যাতায়াত করে বাঁকুড়া থেকে। দূরত্ব প্রায় ৩১ মাইল। বাঁকুড়া থেকে দক্ষিণে বিক্রমপুর মোড়ে নামতে হয়। তারপর সে-বাসটি না-পেলে, হেঁটে যেতে হবে ৫ মাইল। এ গ্রামে পাড়া অনেকগুলি। পাড়ায় পাড়ায় আছেন নানা নামের সব গ্রামদেবদেবী। পাওড়ি, সন্ন্যাসী, মনসা, ভৈরব, উড়্যা, খট্টা, মনসারাম আছেন গ্রামের মধ্যেই। একটু দূরেই আছেন বনদেবী উখড়াকুঁওরি।[১] গ্রাম থেকে পশ্চিমদিকে একটু দূরেই হাতিবাড়ি-রায়বাঁধে আছেন বলদ্যাবুড়ি। বৃহৎ গ্রামের মাঝখানে একটা বড় রাস্তা। এখানে তাকে বলে 'কুলি'। প্রাচীন মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে—বৈষ্ণব কবিতায় কুলি শব্দের ব্যবহার আছে। এই কুলির পূর্ব দিকে আছে 'মহন্ত'দের বাড়ি। তার পাশেই আছে বেশ কিছু নিম ও শেওড়াগাছ। এই গাছগুলির নিচে মাঝিবুড়ার সুপ্রাচীন থান। তাঁর প্রতীক অসংখ্য হাতি ঘোড়া। সেগুলি থানের তিনদিকে আছে জড়ো হয়ে। দূর থেকে তা দেখলে মনে হবে উল্টানো রয়েছে একটি ইংরাজী ইউ।

সাঁওতালদেরই ঠাকুর মাঝিবুড়া। তবে তাঁর পুজো দেন গ্রামের সকল সম্প্রদায়। কর্মকার কুমোর ব্রাহ্মণ বৈরাগী গন্ধবণিক থেকে শুঁড়ি ডোম মাল মাঝি প্রভৃতি সকলেই। গ্রামে শিব আছেন। বোশেখ মাসে গাজন। মেলা বসে ছ-দিন ধরে। চণ্ডী দুর্গা সরস্বতী লক্ষ্মী প্রভৃতি পুজোপান যথানিয়মেই। অন্যান্য লৌকিক দেবদেবীরাও পূজিত হন সাড়ম্বরেই। কিন্তু মাঝিবুড়ার পুজোর ঘাটতি ঘটেনা কোনোদিন। তবে তাঁর দিনপুজোর বিধি নেই। পূজার্থী এলেই পুজো। বছরের চারটি দাগা (সুনির্দিষ্ট) দিনে তাঁর পুজো হবেই। সে দিনগুলো হলো 'অম্ববতী' (অম্বুবাচী, ৭ আষাঢ়), 'এখ্যান' (১ মাঘ), শ্রীপঞ্চমী (সরস্বতী পুজোর দিন) এবং 'শালুই' পুজোর একদিন (সাধারণত তা মাঘের শেষে বা ফাগুনে হয়)। গ্রামেরই সাঁওতালেরা তাঁর পুজো করেন।

---

১. দ্র. রাঢ়ের গ্রামদেবতা (১ম খণ্ড, ১৯৮৯) পৃ. ৮৯-৯১

তাঁদের পদবী হাঁসদা। একসময় এঁদের ছিল রাজপ্রদত্ত খেতাব 'মাঝিমণ্ডল'। পুজোর সময় দেখলুম মাঝিবুড়ার প্রধান ভোগ ছিল দুধ। সেটা তাঁর চাই-ই। তবে চিঁড়ে গুড় মিষ্টি ফলমূল দিলেও আপত্তি করেন না পুজারী। কেউ কেউ দেন চাঁদমালা ও মাটির তৈরী হাতি ঘোড়া। কেউ কেউ দেন ঘি-খিচুড়ির উপকরণ—চাল বিরিকলাই হলুদ জিরে নুন তেজপাতা প্রভৃতি। সকালেই তা দিয়ে আসতে হয় পুজারীর ঘরে। বাড়ির মেয়েরা তা তৈরী করেন। নামে নামে থালায় সাজান্। এমন কি দিয়েও আসেন থানে। এদিন দেশপুজো। তাই পুজোটা হয় বেশ জাঁকজমকেই—বাজনাবাজিয়ে, নাচ গান সহকারে। বলি হয় পাঁঠা। কখনো কখনো পাঁঠা পড়ে দশ পনেরোটিও। তবে পুজোর প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানটি আকর্ষণ করে উপস্থিত সকলকে। সে হলো তীরছোঁড়ার মহড়া। পুজারীদের বাড়িতে রক্ষিত আছে সম্পূর্ণ লোহার তৈরী এক সেট তীর ধনুক। তার ছিলাটি পর্যন্ত লোহার। পুজোর আগেই পুজারী দেবতাকে স্মরণ করে হাতে নেন সেই তীর ধনুকটি। তারপর তীরটি ছোঁড়েন একটি নির্দিষ্ট গাছের দিকে।

শালুই পুজো সাঁওতালদের একটি পবিত্র অনুষ্ঠান। শালবনে যখন নতুন পাতা গজায়, তখনই হয় শালুই পুজো। তাই এর সুনির্দিষ্ট দিনক্ষণ নেই। তবে এ-পুজো না-হলে সাঁওতালরা ব্যবহার করেন না বনের কোনো নতুন পাতা। মাঝিবুড়ার পুজোর দিনে থানে পোঁতা হয় একটি শালডাল। চার ফালি করা হয় তার মাথাটা। যাতে ফাঁক করে বসানো হয় মাটির তৈরী একটি ছোট নতুন খোলা। সেই খোলায় দেওয়া হয় নতুন পাতা। প্রতি পুজোর শেষে নিবেদিত হয় ঘি-খিচুড়ি ও বলির মুণ্ড।

পুজারীদের দাবী, মাঝিবুড়া তাঁদের পূর্বপুরুষ। যদিও এখন তিনি দেবতা, এক সময় তিনি ছিলেন এক শিকারজীবি সাঁওতাল। তিনি ছিলেন অস্ত্র-গুরুও। ইচ্ছুক দেশবাসীকে তিনি শিক্ষা দিতেন তীর-বিদ্যা। কোনো এক সময় থেকে তিনি পরিণতি পেয়েছেন দেবতার, পুজো পেয়েগেছেন অঞ্চলের মানুষগুলির। মাঝিবুড়ার ওপরে গ্রামবাসীর বিশ্বাস অসাধারণ। তাঁদের ধারণা, তিনি দান করেন সর্ববিধ মঙ্গল। কলেরা বসন্ত মহামারী হয় না তাঁর পুজো দিলে। গ্রামবাসী দাবী করলেন, ১৯৮০ খ্রীঃ পর্যন্ত মাঝিবুড়ার পাড়ায় কখনো ঘটেনি এরকম রোগ। আর কিছু মানুষের ধারণা, তাঁর পুজো দিলে হারায় না গাই-গরু, রোগও হয়না তাদের। এমনকি হারালেও সে-গরু ফিরে আসে আপনা আপনি। আমাদের দেশে শিবের মাথায় দুধ ঢালার প্রচলন আছে। প্রথম গাই বিয়োলে তার দুধ তাঁকে দিতেই হয়। ঠিক তেমনি দুবরাজপুরবাসীও প্রথম

দুধটি দেন মাঝিবুড়োর মাথায়। দুবরাজপুর অঞ্চলটাই এখোনো ঘন জঙ্গলে আবৃত। সেকালে এ অঞ্চলের আদিম অধিবাসীরা জীবন যাপন করতেন শিকারে অবলম্বন করেই। তাঁরা শিকারে যাবার আগেই তাই পুজো দিতেন মাঝিবুড়োর। এখনো সাঁওতালেরা শিকারে যাবার আগে তাঁর পুজো দেন কিংবা মানসিক করেন। আর এখনো কোনো কোনো নতুন শিক্ষার্থী তীরছোঁড়ার মহড়া দেন তাঁর থানে এসেই। এসব ঘটনা স্মরণ করায় সেই আদিম তীর শিক্ষার অনুষ্ঠানগুলির। একদা ১ মাঘে পশ্চিমসীমান্তবাংলাব সর্বত্রই পালিত হতো শিকার উৎসব। এখনো এদিনটিতে অঞ্চলবাসীরা মাংস খান যথেষ্ট ভাবেই। 'বরামারা' অনুষ্ঠানও পালিত হয় কোনো কোনো পল্লীতে। সারা পল্লীর সবঘরই এ দিন পায় মাংসের ভাগ। মল্লভূম, শিখরভূম, তুংভূম এবং ধলভুমের প্রতি রাজাই সেকালে শিকারে যেতেন ১ মাঘ। এ নিয়ে উৎসব হতো বিষ্ণুপুরে।[১]

দুবরাজপুরবাসীদের প্রায় সকলেরই ধারণা এবং পূজারী হাঁসদাদের দাবী, মাঝিবুড়ো সেই হাঁসদাদেরই এক পূর্বপুরুষ। এঁদের বংশনামা আছে মুখে মুখে। তা থেকে পাই ঃ (১) মাঝিবুড়ো > (২) ? > (৩) ? > (৪) দুর্গাবুড়ো > (৫) গাঙ্গুবুড়ো > (৬) ১. রজন ২. মদন ৩. টেটে ৪. গুরুচরণ। মদন > জানকী (২য়)। জানকীই বর্তমান পূজারী। ১৯৮০ সালে তাঁর বয়স ছিল ৩০ বছর। অর্থাৎ মাঝিবুড়ো বর্তমান পূজারীব উর্ধ্বপক্ষে আট পুরুষ আগেব ব্যক্তি। অর্থাৎ তিনি জীবিত ছিলেন অন্তত ২০০ থেকে ২৫০ বছর আগে। তা হলে তিনি অষ্টাদশ শতকের প্রথমে বা সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি বর্তমান ছিলেন। দুবরাজপুব ছিল সিমলাপাল রাজ-এসটেটের মধ্যে। এখানের জমিভুমির অনেক পুরোনো রেকর্ডপত্রও আছে সিমলাপালে। তা থেকে হিসাব রক্ষক (শ্রীরজনী কান্ত খাঁ, ৮০) দেখিয়েছেন ১৭৪২ খ্রীঃ-এর কাছাকাছি মাঝিবুড়ো নামে এক ব্যক্তি এক সময় দুহাজার একর জমির সত্ত্বাধিকারী ছিলেন। রাজা তাঁকেই খেতাব দেন 'মাঝিমণ্ডল'। প্রাচীন তহশীলদারের মতে, মাঝিবুড়োই সেই মাঝিমণ্ডল উপাধি প্রাপ্ত প্রসিদ্ধ মানুষ। এখোনো তাঁর লোক-হিতৈষণা, দানধ্যান লোকে স্মরণ করে শ্রদ্ধার সঙ্গে। পশু শিকার, তীরবিদ্যা-শিক্ষাদান প্রভৃতি জড়িয়ে যে মাঝিবুড়োর সন্ধান পাই, তিনি তহশীলদার কথিত—মাঝিমণ্ডল পদবীধারী ব্যক্তিটির সঙ্গে অভিন্ন হতে পারেন। সেকালে এবং একালেও সাঁওতালদের গ্রামপ্রধানকে 'মাঝি' বলা হয়। সে-হিসেবে বর্তমান মাঝিবুড়োও

---

১. সীমান্তবাংলার শিকার উৎসব (১৯৭৮ বর্ধমান ডায়েরী) ঃ মিহির চৌধুরী কামিল্যা।

গ্রামপ্রধান বা তথাকথিত জমিদার থাকতে পারেন। তাই বর্তমান মাঝিবুড়ো পূর্বপুরুষ পুজোর নিদর্শন হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবে কালে কালে ভক্ত বিশ্বাসের নানা জের চেপেছে তাঁর উপাসনার মধ্যে। নানা অলৌকিক বিশ্বাস যোগ হয়েছে প্রচলিত ধারণার সঙ্গে। তাই তিনি হয়ে উঠেছেন কলেরা বসন্ত মহামারীর প্রশমনকারী কিংবা গরু বাছুরের রোগ-অসুখ-উপশমকারী দেবতা। তাহলেও তাঁর মনুষ্য-রূপটি জনমানস থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি॥

চাঁদরায়

বিখ্যাত ব্যক্তিদের নিয়ে সত্য মিথ্যা নানা কাহিনী প্রচার করেন ভক্তরা। মহাপুরুষ বা ধর্মপ্রবক্তা কিংবা সাধু সন্ন্যাসীদের ওপর এরকম কাহিনী পাওয়া যায় প্রচুর। চৈতন্য নিত্যানন্দ প্রমুখের ওপর নানা অলৌকিক গল্প সৃষ্ট হয়েছে কালে কালে। শক্তিশালী সাবিযোদ্ধা, প্রজাবৎসল জমিদার বা দরিদ্র-সেবক রাজা-রাণী, তাঁদের নিয়েও কাহিনী মেলেছে নানাস্থানে। এককালে বাংলার বার-ভূঁইয়াদের নিয়েও এরকম প্রচুর কাহিনী শোনা যেত অখণ্ড বাংলার স্থানে স্থানে। বাংলাদেশের বিক্রমপুরে বারভুঁইয়াদের অন্যতম কেদাররায়ের মানুষ বাঁচানোর অলৌকিক কাহিনী জানে অনেকেই। ভাওয়ালের খাজলগাজীও অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন ছিলেন বলে শোনা যায়। এই বারভুঁইয়াদের আর একজন ছিলেন চাঁদরায়। তাঁর মাহাত্ম্য নিয়েও অখণ্ড বঙ্গে কাহিনী আছে অনেক। সে নিয়ে স্মৃতিপুজোও আছে কোনো কোনো স্থানে। সেই স্মৃতিই বহন করছে বেলিয়াড়া গ্রামের চাঁদরায় নামক গ্রামদেবতার পুজোমহোৎসব।

'চাঁদরায়' বললেই লোকে স্মরণ করেন ধর্মঠাকুরকে। পশ্চিম বাংলার নানা স্থানেই চলিত আছে তাঁর পুজো। মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণা থানার বনপুরে তিনি পুজিত হন সাড়ম্বরেই। বীরভূমের অনেকগুলি গ্রামেই তাঁর থান আছে। তেমন গ্রাম হলো ইলামবাজার থানার কুড়মিঠা; লাভপুর থানার দাঁড়কা; নানুর-নানার উচকরণ; সিউড়ী থানার কালিপুর, খটঙ্গা, পুরন্দরপুর, ভাণ্ডিরবন, লম্বোদরপুর; খয়রাশোল থানার শিরা, বড়রা, ভাদুলিয়া; বোলপুর থানার গোয়ালপাড়া এবং দুবরাজপুর থানা কজ্ঞাং প্রভৃতি। এসব স্থানেই তিনি পুজিত হন ধর্মঠাকুরের ধ্যানে ও পুজোমন্ত্রে। পুজো করেন ব্রাহ্মণপুরুত কিংবা 'পণ্ডিত' উপাধির পুজারী। কোথাও কোথাও তিনি ডোমদের নিজস্বঠাকুর।

কিন্তু বেলিয়াড়া গ্রামের চাঁদরায় ধর্মঠাকুর নন। বাঁকুড়া জেলার ওঁদা থানার ছোট গ্রাম বেলিয়াড়া, বাঁকুড়া শহর থেকে গন্ধেশ্বরী নদী পেরিয়ে মাইল চারেক

পূর্বে। নিকটেই রেলস্টেশন ভেদুয়াশোল। সেখান থেকে হেঁটে গ্রামে যেতে এক মাইল। গ্রামের একদিকে মাঝিপাড়া। মাঝিপাড়ায় চাঁদরায়ের সাময়িক লুপ্তপ্রায় থান। অনেকদিন আগেই মাঝিরা উঠে গেছেন পুবদেশে। এখনও আছেন যে ক-ঘর, তাঁরাই পুজো উৎসব করছেন চাঁদরায়ের। তাঁদের বাড়ির পাশেই গাছতলায় বসানো হয় চাঁদরায়ের প্রতীক। পাঁচমুড়ার একটি বড়ো হাতি, গলায় তার পৈতে,—চাঁদরায়ের তাই হলো আসল প্রতীক। হাতির কাছে রাখা হয় আরো কিছু ছোটো ছোটো হাতি-ঘোড়া। এখন পুজো তাঁব প্রায় হয়না বললেই চলে। এখন প্রয়োজনে যেকোনো ব্রাহ্মণকে ডেকে 'নমো নমো' করানো হয়। একসময় এঁর পুজো হতো বেশ ধুমধাম করেই। বাজনা বাজতো। ভক্ত্যা নাচতেন। কাগুজে ঘোড়ার নাচও চলতো সারা সন্ধ্যে। সম্প্রতি পুজো করছেন পার্শ্ববর্তী হরিণবালা গ্রামের বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রাহ্মণেরা।[১] সেবাইৎ ও উপাসক সারাগ্রামের মাঝি সম্প্রদায়। শোনা যায় একসময় চাঁদরায়ের পুজো করতেন মাঝিরাই। ভায়াদি বিবাদ থেকেই আরো পরে একসময় নিয়োজিত হয়েছিল ব্রাহ্মণপুজাবী। তাঁর বার্ষিকী পুজো শ্রাবণ সংক্রান্তিতে। আগের দিন থেকেই অনুষ্ঠান। আগের দিন ঘ-পুজো, তাকে বলে 'বারি'। অর্থাৎ এদিন শোভাযাত্রা সহকারে ঠাকুরের প্রতীক কাঁধে নিয়ে সারাগ্রাম ঘোরা হয়। এবং শেষে বারি আনা হয় গন্ধেশ্বরীর জল থেকে। সে অন্তত মাইল দুয়েকের রাস্তা। কিন্তু ক্লান্তি নেই উৎফুল্ল জনতার। সংক্রান্তির দিন সেই বারিতে আনুষ্ঠানিক পুজো। বারি আনার সময় ভর হয় কয়েকজন মাঝি যুবকের। পুজোর দিনেও ভর হয় আর কারো কারো। ভর হলে তিনি বা তাঁরা মাটিতে সজোরে হাত চাপড়ান। পুজোর ত্রুটি সম্পর্কে বলেন নানা কথা। মুদা ধরেন রোগীরা। উপশমের উপায় বলে দেন তিনি। পুজো চলে সন্ধ্যে থেকে গভীর রাত পর্যন্ত।

তাঁর পুজোর মন্ত্র—বাংলা সংস্কৃত মেশা। অনেকটাই ভুল শব্দে ভরা। উচ্চারণেও অনেক ত্রুটি। সে মন্ত্রটি হলো :

১. ধ্যান : ওঁ চাদরায়ং নমস্তুতে। চাঁদরায়ং সমাপন্নং যদকীর্তি সমাভুতে। যদানাঙ্জং সদাপ্রাজ্ঞং চাঁদরায়ং সর্মাস্থিতং। যদাক্লিন্না সমাভুতা তব কীর্তি বিসর্জিত।

২. ফুল বা নৈবেদ্য ধরে তিনবার : ইদং অর্ঘ্যং সমাভুক্ত চাঁদরায়ং সমস্থিতং। ইদং ক্লিন্ন সমাভুতা যশকীর্তি বিমোহিতং। তব পদাম্বুজ সদা ভক্তিহীনং যদা নরং মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং চ মানবাং। তব পুজা বিনির্মতা চাঁদরায়ং নমস্তুতে।

---

১. গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, রতন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৭২ সালে)।

৩. স্তোত্রাবলীঃ ইদং স্তোত্রং সমাস্থিতং চাঁদরায়ং নমস্তুতে। ইদংস্তোত্রং সমাযুক্তাং ব্রাহ্মণস্য নন্দনসুতং। তব কীর্তিযশ ষং সর্বকর্ম-বিনির্মতা। সমানিতৎ মহাবাহুং মহাবীর্যং সমাস্তোত্রং।...তব চরণ-প্রসাদেন যশকীর্তি সমাস্হিতং। ব্রাহ্মণস্যনন্দন তুমি অজ্ঞান যে নর আমি নিজগুণে কৃপাকর সর্বজনে। ব্রাহ্মণস্যানন্দনসুতং নমঃ চাঁদরায়ং। ইত্যাদি (মন্ত্রটি বৃহৎ। আমরা নিলুম সামান্য অংশ)।

চাঁদরায় মাঝিদের নিজস্ব দেবতা। তাঁরাই তাঁর একমাত্র উপাসক। তবে পাশাপাশি অনেক গ্রামের মানুষই তাঁর পুজো দিতে এসেছেন। কিছুদিন আগে পর্যন্ত থানে একটি চমৎকার অনুষ্ঠান হতো, এখনো হচ্ছে। সে হলো কৃত্রিম যুদ্ধের। বেলিয়াড়া, ধগেড়া, মালাতোড়, ভেদুয়াশোল, লোদনা, ভাদুল, সোনা-তাপল প্রভৃতি গ্রামের মাঝি যুবকেরা অংশ নেন এই কৃত্রিম যুদ্ধে। তাঁরা আসেন যুদ্ধের সাজপোশাক পরে, বর্শা-বল্লম-তলোয়ার হাতে। নির্দিষ্ট স্থান থেকে বাঁশি বাজে। ছুটে আসেন দুই প্রতিপক্ষ যোদ্ধা ভীড় ঠেলে। তারপর ঠকাঠক্ শব্দ। যুদ্ধ চলে। যুদ্ধ করতে করতে তাঁরা নিষ্ক্রান্ত হন থান থেকে। প্রচণ্ড ভিড় হয় এই যুদ্ধানুষ্ঠান দেখার। এ নিয়েও গল্প আছে কিছু। একবার অযোধ্যার (ওঁদা থানা) রাজা (জমিদার) পালকি চেপে যাচ্ছিলেন মালাতোড়। চাঁদরায়ের থানে যুদ্ধানুষ্ঠান দেখে তিনি করলেন কুৎসিত মন্তব্য—'যত সব ছোটলোকদের মাত্‌লামি'। কিন্তু তিনি আর পেঁছুতে পারলেন না মালাতোড়ে। মাথা ঘুরিয়ে একসময় পড়ে গেলেন পাল্কি থেকে। ভৃত্যরা তা বুঝতে পারলেন। তাঁরা গিয়ে পড়লেন চাঁদরায়ের থানে। রাজার চেতন হলো। তিনি ভুল বুঝতে পারলেন। সাড়ম্বরে পুজো দিলেন চাঁদরায়ের। এখনো পুজো আসে অযোধ্যায় রাজবংশ থেকে। অবশ্যই এ-গল্প চাঁদরায়কে জাগ্রত দেবতা হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা। তেমনি তাঁর নামে মন্ত্রের উচ্চারণ, সেও তাঁকে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে তুলবার আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু চাঁদরায় সম্পর্কে আর কোনো লোক-আকর্ষক সংস্কার নেই। কোনো রোগ শোক দূরকরা কিংবা কৃষি, শস্য, সন্তান লাভ চাঁদরায়ের মাহাত্ম্যে জড়িত হয়নি কোনোদিনই।

এ সম্পর্কে প্রাচীন মানুষেরা বলেন আর এক কিংবদন্তী। তাঁরা বলেন চাঁদ-রায় দেবতা ছিলেন না কোনো কালেই। তিনি ছিলেন বীরপুরুষ বারভূঁইয়াদের একজন। বেলিয়াড়ায় যে 'বঙ্গভুষণ' উপাধির ব্রাহ্মণেরা আছেন, চাঁদরায়ই দিয়ে-ছিলেন তাঁদের সে উপাধি। বঙ্গভুষণদের বংশধরেরা এখনো আছেন এ-গ্রামে। তাঁদের কৌলিক পদবী চট্টোপাধ্যায়। চাঁদরায়ের ছিল একটি বিরাট দল। একটা অসামান্য নৌবাহিনীও তাঁর ছিল। একবার সেই নৌবাহিনীর কয়েকজন বিপর্যস্ত

মাঝি এসেছিলেন এ-গ্রামে। সঙ্গে এনেছিলেন বঙ্গভূষণ ব্রাহ্মণদেরও। চাঁদরায়ের ওপর মাঝিদেরও শ্রদ্ধা জন্মেছিল অগাধ। তাঁরা তাঁকে মানতেন দেবতা বলেই। তাঁদের বিপদের আশ্রয় ও সম্পদের বন্ধু ছিলেন চাঁদরায়। তাঁকে সাক্ষাৎ না পেয়ে মাঝিরা প্রতিটি সন্ধ্যায় তাঁর নামগান আরম্ভ করলেন খোল করতাল বাজিয়ে। এমনি করেই তাঁর প্রতীক পূজিত হলো একসময়। ক্রমে ক্রমে তিনি উন্নীত হলেন দেবতায়। তাঁর নামে বসলো হাতি ঘোড়া। দেবতার মতোই তাঁকে তন্ত্রে মন্ত্রে শ্রদ্ধা ভক্তিতে পুজো আরম্ভ করলেন মাঝিরা।

এথেকেই বুঝতে পারি চাঁদরায় যথার্থই বীরপুরুষ পুজোব নিদর্শন। এ হলো আশ্রয় ও আহার দাতা মানুষের প্রতীক পুজো, গুণ মুগ্ধ ভক্তদের শ্রদ্ধা-ঞ্জলি। কৃত্রিম যুদ্ধের কথা প্রসঙ্গে গ্রামবৃদ্ধেরা বললেন আর এক নতুন তথ্য। চাঁদরায় ছিলেন বীর দেশপ্রেমিক। তিনি অধীনতা স্বীকার করেন নি জীবনে। যুদ্ধ ভালবাসতেন। এবং যুদ্ধের কৌশল শেখাতেন মাঝিদের। তাঁর অসামান্য রণকৌশলকে ভক্তরা চেয়েছিলেন বছরে বছরে স্মরণ করতে। সে জন্যেই থানে কৃত্রিম যুদ্ধের মহড়া হয়। অর্থাৎ চাঁদরায় উপাসনায় গ্রামদেবতার প্রচলিত সংস্কার নেই কোনো। বীরপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোই ছিল তার মূল উদ্দেশ্য। সেজন্যেই মাঝি ছাড়া, সাধারণ মানুষকে এ দেবতা আকর্ষণ করতে পারেনীন কোনোদিন। কালের গতিকে তাঁর উপাসনা রীতিটি তাই উঠবার মুখে॥

বাগরাই সিং

পুরুলিয়া জেলার থানা শহর মানবাজার। শহর পুরুলিয়া থেকে তা প্রায় ৪৫ কি.মি. দক্ষিণ-পূর্বে। এক সময় জৈন-সংস্কৃতির একটি বড় কেন্দ্র ছিল এটি। বিভিন্ন স্থানেই এমন অনেক জৈন তীর্থংকর মূর্তি বর্তমান। একসময় মান-বাজারের রাজা এবং তাঁর পরিবার এখানেই বসবাস করতেন। ১৯৩৩ থেকে ৩৮ খ্রীঃ পর্যন্ত মানবাজারই ছিল প্রাচীন মানভুমের সদর দপ্তর। এখন প্রায় সাড়ে ছ'হাজার লোকের বাস। পাশেই বুধপুর, বুদ্ধেশ্বর শিবের জন্য বিখ্যাত। এখানেও অনেক জৈন মূর্তি আছে। আরো পাশাপাশি অনেক গ্রামেই এমনি মূর্তি প্রচুর মিলেছে। যেমন পুঞ্চা কিংবা পাকবিড়রায়। মূর্তিগুলির মধ্যে ঋষভনাথ, শম্ভুনাথ, মহাবীর, শ্রেয়াংষনাথ, চন্দ্রপ্রভ, পদ্মপ্রভ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও মিলেছে যক্ষিণী, শ্মশানদেবী, এমনি আরো কিছু মূর্তি। অনেক কবরস্থানও আছে ভুঁইয়াদের। ডুংরি, দাড়াং মালভুমির দেশ এটি। এদেশের শ্রেষ্ঠ জৈন

মতালম্বীদের এটা ছিল প্রধান আশ্রয়স্থল। ইংরেজ পণ্ডিত বেগলার এখানে এসেছিলেন। এইসব অঞ্চলের মন্দির ও মূর্তি তিনি পরীক্ষা করেছিলেন। তিনি তাঁর রচনায় ১৯টি পাথরের মন্দিরের উল্লেখ করে গেছেন। বুধপুরের মন্দির-টিকে বেগলার দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর সৃষ্টি বলে মনে করেন। মানবাজারের কাছেই আর একটি পুরোনো গ্রাম জিতুজুড়ি। তার পাশে আছে পাথরের মন্দির ও মূর্তি। অর্থাৎ এই অঞ্চলটি প্রাচীন সংস্কৃতির একটি পীঠস্থান ছিল তা সহজেই অনুমেয়।

মানবাজারের পুরাতন হাটতলা। তার পাশেই একটি ফাঁকা জায়গায় আছেন প্রাচীন গ্রামদেবতা বাগরাই সিং। কোনো মন্দির নেই। চালাও নেই। খোলা আকাশের নীচে একটি ঝোপে তিনি বর্তমান। তাঁর প্রতীক কিছু নতুন পুরোনো ভাঙা-চোরা হাতি ঘোড়া। থানের এলাকা খুব বড়োও নয়। প্রতিদিন তাঁর পুজোও হয় না। সপ্তাহে দু'দিন তাঁর পুজো। শনি ও রবিবার ধরে। তাঁর বাৎসরিক পুজো পয়লা মাঘ, স্থানীয় ভাষায় 'এখ্যান'দিনে। পুজো করেন এখানেরই লোহার সমাজের ব্যক্তি।[১] পুজো দেন প্রায় সব জাতির লোকই। হাট-বার বলে তাঁর পুজোয় ভীড়ও হয় প্রচণ্ড। পুজারী বলেছেন, ভক্তিই তাঁদের পুজোর মন্ত্র। আর আছে গুরুমন্ত্র, তা কাউকে বলা চলে না। ফলে মন্ত্র জানা যায়নি এ দেবতার। এবং মন্ত্র যে কিছু আছে, এমন প্রমাণও মেলে না এখানে। নৈবেদ্য নিতান্তই সাধারণ। যেমন আর সব দেবতাদের লাগে, তেমনি আলোচাল, সেদ্ধচাল, ফলমূল, তেল-সিঁদুর প্রভৃতি। পাঁঠাও পড়ে তাঁর নামে। 'এখ্যান-পুজো'য় বলি প্রচুরই হয়। এসব ছেড়ে দিলে এ-পুজোয় একটি প্রাচীন রীতি মানা হয় কঠিন ভাবে। ঠাকুরের পুজো একবার হলে, যেমন সেদিন নতুন করে তাঁর পুজো করতে নেই, তেমনি পুজো করে বাড়ী ফেরার সময় ঠাকুরের দিকে আর পেছন ফিরে তাকাতে নেই। এ বিশ্বাস বহুদিনের। এ নিয়ে গল্পও কম নেই। সে-গল্প এ-দেবতার মানুষ-রূপের সঙ্গে-যুক্ত।

বাগরাই ছিলেন এ অঞ্চলের একজন বীরযোদ্ধা। তাঁর ছিল অসম্ভব রূপ। সে রূপে মজেনি এমন নারী ছিল কম। একদা তাঁর রূপে অস্থির হয়েছিলেন মোড়লের বউ। তাই তাঁর বিচার হয়েছিল গ্রাম-মোড়লের অধীনে। মোড়ল তাঁকে ধরে এনেছিলেন এক হাজার বীর যোদ্ধা দিয়ে। মোড়লের নির্দেশে তাঁর প্রাণ ছেদ হয়েছিল। তারপর সেই কাটা মুণ্ড আর ধড় রেখে মোড়ল দলবল নিয়ে ফিরেছিলেন। সন্ধ্যেবেলায় গ্রামের কুলবতীরা গা ধুতে যাচ্ছিল। পথে

---

১. শ্রীযদু লোহার (৫২), পিতা ৺আশু লোহার।

বাগরাইয়ের কাটা মুন্ড দেখে তারা অস্থির হয়েছিল। এমন বিহ্বল হয়েছিল যে, কেউ আর বাড়ী ফিরে যেতে পারেনি। তারা তাঁর পুজো করেছিল নিজেদের কলসীর জল দিয়ে। অমনি বেঁচে উঠেছিলেন বাগরাই। খন্ডিত দেহ এক হয়েছিল। তখন কুলবতীরা ছুটে পালিয়েছিল যে যার বাড়ীতে। কিন্তু বাড়ীতে এসেও তারা স্থির থাকতে পারেনি। সন্ধ্যাপ্রদীপ হাতে নিয়ে বাগরাইয়ের বন্দনা করেছিল। ক্রমে ক্রমে প্রতিটি সংসারে নানা অমংগল দেখা দিল। মোড়ল স্বপ্নাদৃষ্ট হলেন। বাগরাইয়ের পুজো না-দিলে কারো নিস্তার থাকবে না। কুলবতীদের নিয়ে তিনি সেদিনই পুজো আরম্ভ করলেন। কিন্তু পুজান্তে আর নারীদের সে মূর্তি দেখতে দিলেন না। সেই থেকে বাগরাই পুজোর পর আর দেবতার দিকে পিছন ফিরে তাকাতে নেই।

বাগরাই সম্পর্কে আরো কাহিনী আছে। তিনি ছিলেন কইডাগ্রামের মানুষ। তাঁর সমান যোদ্ধা সেকালে আর ছিলেন না। রূপবান পুরুষ হিসেবেও তাঁর খুব খ্যাতি ছিল। পঞ্চকোটের রাজা তাঁকে এনেছিলেন সেনাপতি করে। কিন্তু রাণী তাঁর রূপে মুগ্ধ বলে জানতে পারলেন রাজা। অমনি রাজা বন্দী করলেন বাগরাইকে। নিজ হাতে হত্যা করবেন বলে ঘোষণা করলেন তিনি। মশানে নিয়ে আসা হলো বাগরাইকে। বন্দী বাগরাই বললেন, তিনি খেলা ভালোবাসতেন। তাই শেষবারের মতো খেলাটা দেখাতে চাইলেন তিনি। বললেন, খেলা দেখানোর সময় রাজা যেন তাঁকে গুলি করে হত্যা করেন। একটা গাড়ীর চাকা নিয়ে খেলা দেখাচ্ছেন বাগরাই। সোঁ সোঁ ঘুরছে চাকা। খেলা আর বন্ধ হচ্ছে না। তিতিবিরক্ত রাজা তাঁকে এরপর গুলি করছেন একের পর এক। বাগরাইয়ের কিছু হচ্ছে না দেখে একযোগে সব সেনাপতিরাও গুলি আরম্ভ করলেন। কিন্তু বাগরাইকে গুলি লাগছে না। তিনি উঠে যাচ্ছেন আকাশে। একসময় চাকাসহ মিলিয়ে গেলেন তিনি। তারপর একদা মড়ক নামলো রাজ্যে। রাজা স্বপ্নাদৃষ্ট হলেন। পুজো করলেন বাগরাইয়ের। মড়ক থেমে গেল। সেই থেকে বাগরাই পুজো চালু হলো।

কইড়া গ্রামে এখনও আছেন সিং-পাতর পদবীর লোকেরা। এঁরা দাবী করেন বাগরাই তাঁদের পূর্বপুরুষ। বর্তমান বংশধর থেকে বাগরাই অন্তত বিশ পঁচিশ পুরুষ আগের মানুষ।

গল্পগুলি বিশ্লেষণ করলে বাগরাই যে রূপবান পুরুষ ছিলেন, সে সত্য উদ্ঘাটিত হয়। এবং রূপের জন্যেই নিহত হলেন এঘটনাও জানা যায়। দুটিই অবৈধ প্রেমের কাহিনী। এদেশে প্রায় স্থানেই এমনি কাহিনী প্রচলিত আছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'কাব্যে কিংবা 'ময়মনসিংহগীতিকায়' এ-নিয়ে চমৎকার কাহিনী মিলছে। এ-অঞ্চলের ভাদু-টুসু-করমগানে অবৈধ প্রেমের এমনি কাহিনী

কম নেই। ভাদুর গানে এই রকম প্রেমচেতনার গল্প খুব ঘনিষ্ঠ। ভাদু-টুসুর মধ্যেও বিশেষজ্ঞরা মানবী তথ্যের সন্ধান পান। বাগরাই পুজোর মধ্যেও মানুষের ইতিহাস থাকাটা অসম্ভব নয়। ইতিহাসেও আছে সেনাপতির প্রতি রাজকন্যা এমনকি রাণীর রূপমুগ্ধতার কথা।

তবে লৌকিক বিশ্বাসে বাগরাই ক্ষেত্রদেবতা। উৎকৃষ্ট ফসল লাভের জন্যেই তাঁর পুজো। লোকের বিশ্বাস, তাঁর পুজো দিলে ধান চুরি যাবে না। এমন কি পোকামাকড়ও ফসল নষ্ট করবে না। তাঁর সম্পর্কে দ্বিতীয় বিশ্বাস, তিনি বিপদ উদ্ধারকারী দেবতা। চোর ডাকাতের হাত থেকে তিনি ভক্তদের রক্ষা করেন। সন্তানদাতা হিসেবেও বাগরাইয়ের নামডাক ছিল এক সময়। সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে প্রচলিত বিশ্বাসগুলি পাল্টে গেছে। তা হলেও তাঁকে প্রাচীন কৃষিকেন্দ্রিক সভ্যতার উর্বরতা বাদের সঙ্গে যুক্ত করতে হয়, মানতে হয় স্মৃতি পুজোর নামান্তর হিসেবেও॥

বুড়াবুড়ি

রাঢ়ের গ্রামদেবতারা বড় বিচিত্র। বিস্ময়কর তাঁদের নামগুলিও। নাম আছে পুরুষভেদে। নাম আছে নারীভেদে। এমন নামও মিলেছে, যা নারী-পুরুষ মিলিয়ে, কিংবা তাদের সামাজিক সম্পর্ক ধরে। এমন সব নামও আছে, সাধারণভাবে যাদের তাৎপর্য ধরা যায় না। কিন্তু উপভোগ করা যায় চমৎকার কৌতুক। বাঁকুড়া জেলার খুব অপরিচিত কিছু গ্রাম, প্রায় গ্রামেই রাস্তা-ঘাট এখনো হয় নি, চারদিকে বন বাদাড়, পাহাড় কিংবা টিলা, নদী কিংবা মালভূমি। এই যেমন বাঁকুড়ার রাইপুর থানার সাতপাটা-দেমুস্না গ্রাম। বড় রাস্তা মণ্ডলকুলি থেকে মেঠো রাস্তায় যেতে হয়। সেখানে আছেন এক গ্রামদেবতা, তাঁর নাম 'ননদ-ভাজ'। ওঁদা থানার ক্ষুদ্রপল্লী মেদিনীপুর গ্রাম, সেখানে আছেন গ্রামদেবতা 'খুঁকা-খুঁকি'। খাতড়া থানার হিড়বাঁদের কাছে আছে অজ পাড়াগাঁ বরকনা। সেখানে আছেন 'বরকনাদেবী'। এমনি আর দুটি দেবতা আছেন ছাতনা থানার শুনিয়াপাহাড়ের অনতিদূরে থুমপাথর গ্রামে 'ভাসুর-বুয়াসিন', এবং জিড়রা গ্রামে 'বুড়াবুড়ি।' একান্ত লৌকিক এই নামগুলি, একান্ত গ্রামজনই এঁদের উপাসক।

বাঁকুড়ার পশ্চিমঅঙ্গে বিরাট পাহাড় শুশুনিয়া। প্রায় ১৫০০ ফুট উঁচু। পুবে-পশ্চিমে মাইল দুয়েক বিস্তৃত। এখান থেকে ঘন বন, নদী আর টিলা পেরুলেই জিড়রা গ্রাম। ঝাঁটিপাহাড়ী দিয়েও বড় রাস্তা ধরে যাওয়া যায়। জিড়রার মাঝখানে কালীর বিখ্যাত মাড়ো। তার পাশেই গ্রামঠাকুর খুদান্যাড়ার

আশ্চর্য প্রতিকৃতি। এসব ছাড়িয়ে উত্তরে বয়ে চলেছে গন্ধেশ্বরী নদী। নদীর উপরেই বিরিবাড়ি। এখানে চাষীরা 'বিরি' অর্থাৎ মাস-কলাইয়ের চাষ করেন। এখানে বাস করেন ক'ঘর সাঁওতাল। তাঁরা এখানের আদি বাসিন্দাও। তাঁদেরই ঠাকুর বুড়োবুড়ি।

পাহাড়ে নদী গন্ধেশ্বরী। সাঁওতাল পল্লীর পাশে এসেই সে হয়েছে পূর্ব-বাহিনী। ঠিক তার মুখেই দুটি বিরাট খাড়া পাথর। বড়টির মাপ নীচের দিকে আট ফুট, মাঝে ছ' ফুট ও উপরে তিন ফুটের বেড়। উঁচু ষোল ফুট। এটিকে এঁরা বলেন বুড়ো-ঠাকুর। তার গায়ে লাগা বুড়ি-ঠাকুরটি সামান্য ছোটো। সেটি নীচের দিকে ছ' ফুট। মাঝে পাঁচ ফুট। উপরে তিন ফুটের বেড়। এর উচ্চতা তের ফুট। এ দুটির পাশে আছে আরো দুটি ছোটো ছোটো পাথর। লোকে এদের বলেছে—বুড়োবুড়ির ছেলেমেয়ে। পুরুত বলছিলেন, এগুলি 'বুড়ো-বুড়ির বাহন'। যখন ঘনঘোর বর্ষা আসে, নদীতে আসে হড়কা বান, লোকে বলে সে বান বুড়োবুড়িকে চান করিয়ে দিয়ে যায়। গ্রীষ্মে জল কমে যায়। তখন প্রতীকগুলি হয়ে ওঠে ঝরঝরে। লোকে বলে, ঠাকুর তখন হাসতে থাকেন। এমনি অনেক কথাই আছে বুড়োবুড়ি সম্পর্কে।

গ্রামবাসী বলেন, বুড়োবুড়ি ছিলেন তাঁদেরই পূর্বপুরুষ। দু-জনেই জানতেন নানা অলৌকিক কাজকর্ম। বিপদাপদে দেশবাসী তাঁদের কাছে সাহায্য পেতেন সব রকমের। প্রসবকার্যে বুড়ি ছিলেন অসামান্য। একবার হলো প্রবল বন্যা। বন্যায় সব মাঠ ক্ষেত ডুবে গেল। গ্রামের ছাগল-ছেড়ি গরু-কাড়া কোথায় যেন তলিয়ে গেল। বুড়ি গেলেন বান থামাতে। কিন্তু নদী তখন উঠেছে ক্ষেপে। বুড়ি ঝাঁপিয়ে পড়লেন নদীতে। বুড়ো ছুটতে ছুটতে নদীর ঘাটে এলেন। ডুবে-যাওয়া বুড়িকে গেলেন ধরতে। বন্যা গেল থেমে। জল গেল সরে। কিন্তু বুড়োবুড়িকে আর পাওয়া গেল না। যে ঘাটে এতদিন তাঁরা বাসন মাজতেন, সেখানে দেখা গেল এই দুটি বিরাট বড় পাথর। বিস্মিত হলেন গ্রামবাসী। পাথর দুটিকেই তাঁরা পুজো করলেন বুড়োবুড়ি জ্ঞানে। স্বপ্নাদেশ হলো, নদীতে বন্যা এলেই যেন তাঁরা পুজো দেন বুড়োবুড়ির। ফসল নষ্ট হলেই যেন তাঁরা বুড়োবুড়িকে স্মরণ করেন। সেই খবর পেয়ে পাশাপাশি সব গ্রামের লোকেরা জড়ো হলেন। সাড়ম্বরে পুজো করলেন সকলেই।

অর্থাৎ বুড়োবুড়ির সঙ্গে গ্রামবাসীরা একটা রক্তের সম্পর্কে দাবী করতে চান। এ নিয়ে তাঁরা গল্প বলেন অনেক। তাঁদের বিশ্বাস, বুড়োবুড়ির করুণাতেই নেমে গেছে নদীর খাদ। আর এখানে বন্যা হয়না কোনো বছরই। বৃষ্টি না-হলেও তাঁদের ফসলের ক্ষতি হয় না কখনো। নদীর গাবায় যে গৃহপালিত

পশুরা বিচরণ করে, বাঘ ভালুক হায়নায় তাদের টেনে নেয় না কখনো। বুড়াবুড়ি গ্রাম রক্ষা করেন। তিনি তাঁদের মনস্কামনাও পূর্ণ করেন সব দিন। এমনি প্রবল বিশ্বাস জিড়রা, জোড়াহিরা এবং এতদ্অঞ্চলের সমস্ত সাঁওতাল সমাজের। তানুন্নত আর সব সমাজও এ-বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন না।

বুড়াবুড়ির পুজো এখন বন্ধের মুখে। তাঁর আড়ম্বর অনেকদিন আগেই কমে গেছে। বিরিবাড়ির সাঁওতালরাই এঁর পূজারী। পয়লা মাঘ তাঁর পুজো। বৃষ্টি না-হলে বা অধিক বৃষ্টি হলে তাঁর পুজো দেন সাঁওতালেরা। এজন্যে কোনো নৈবেদ্য লাগে না। গ্রামের লোকজনকে হৈ-হুল্লোড় করে এ-পুজোতে আসতেও হয় না। পুজোর দিনে পূজারী আসেন দু-চারজন ছেলে-পুলেকে নিয়ে। বন থেকে তুলে নেন কিছু শাল কিংবা এঁতাড় ফুল। না-পেলে আকন্দ কিংবা কাঁটা ফুলও চলে। শালপাতায় গুলে নেন কিছু তেল সিঁদুর। আর বলি দেন একটি সাঁড়া মোরগ। মন্ত্র নেই, কিন্তু পূজারীর আবেগও কম থাকে না। কেবল অতিবৃষ্টিতে কিংবা বন্যায় তাঁকে মানসিক করতে হয় শাদা সাঁড়া। খরায় লাগে লাল সাঁড়া।

ছোটনাগপুরে আছেন যেসব মুণ্ডারা, তাঁদের ঠাকুরের নামও বুড়াবুড়ি। বীরভূমের সিউড়ী থানার সেকমপুরে যে-সাঁওতালরা বাস করেন, তাঁদেরও একটি বুড়া-বুড়ির থান আছে। এখন সেখানে থাকেন এক ধর্মঠাকুর। সাঁওতালরাই তাঁর পূজারী। এখানে পূজারীকে বলেছে 'মাঝিদড়ম'। আবার মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুর থানায় একটা ছোট্ট গ্রামের নাম বুড়াবুড়ি-কালুপুর। কাঁথি থেকে হলদী নদী পেরিয়ে এ গ্রামে যেতে হয়। গ্রামের প্রাচীন নাম কালুপুরই ছিল। সে নামের সঙ্গে যোগ হয়েছে বুড়াবুড়ির মাহাত্ম্য। গ্রামের বুড়োরা বলেন, সেকালে গ্রামের পূর্বদিকে ছিল গভীর জঙ্গল। সেই জঙ্গলের মধ্যে ছিল বুড়োবুড়ির পাষাণ মূর্তি। জঙ্গলের কাছেই যে গোখুরী গ্রাম, সেখানের সামন্তরা ছিলেন তাঁর সেবাইত। থানের পাশেই হলদী নদী। এ নদীর একটি দহের নাম 'বুড়াবুড়ির দহ'। বুড়াবুড়ির বাহন ছিল কুমীর। সে থাকতো এই দহেই। মাঝিরা নৌকো করে এ দহে আসতেন। গুড় দিতেন বুড়াবুড়ির নামে। অমনি ভেসে ওঠতো সেই কুমীর। সে গুড় খেতো। এখানেও বুড়াবুড়ির নামে আছে তাঁর মানুষ রূপের প্রবাদ। তাঁরা একসময় ডুবে গিয়েছিলেন এখানে। লক্ষ্য করেছিল সেটা রাখাল বালকেরা। এখানে ডুবে যেতো নৌকা এলেই। তখন থেকেই মাঝি-মাল্লারা শুরু করে বুড়াবুড়ির পুজো। জল খেতে গিয়ে গাই-বাছুর দহে ডুবে যেত। তাই রাখালেরা রেহাই পেতে বুড়াবুড়ির দিয়েছিল

পূজো। এখানেও বুড়োবুড়ি নদী-দেবতা কিংবা দহ-দেবতা। প্রাচীনেরা বলেন —তিনিও বন্যা রোধ করেন। জলপথের বিপদ দূর করেন। গুড় দিয়ে তাঁর নামে লোকে সিন্নি দিতেন মাসে মাসে। এখনো সিন্নি দেন কেউ কেউ। প্রধানত গুড়ের জন্যেই এই অঞ্চলটা ছিল বিখ্যাত। সিন্নি সাধারণত দেওয়া হয় মুসলমান পীরপীরাণীদেরই উদ্দেশ্যে।

এসব থেকে মনে হয় বুড়োবুড়ি পূর্বপুরুষ পূজোর রূপান্তর হতে পারে। কবে, কোন্ কালে, কোন্ আদিম ভাবনায় মানুষ গ্রামদেবতায় পর্যবসিত হয়েছিল, আজ তার যথার্থ বিবরণ মিলবে না। তবে সাঁওতাল সংস্কৃতিতে কিংবা আদিম নিষাদ সংস্কৃতির এক প্রাচীন সাক্ষী পূর্বপুরুষ পূজো। এমন দিন ছিল, যখন সমাজ ছিল মাতৃতন্ত্রের অধীন। তখনকার গ্রামদেবতা ছিলেন কোনো দেবী। কিন্তু সমাজ যখন পিতৃতন্ত্রে পরিবর্তিত হয়, তখন মাতৃদেবীর পাশেই স্থাপিত হন পিতৃ-দেবতা। ফলে পাশাপাশি অবস্থান করতে থাকেন মাতৃদেবী ও পিতৃদেবতা। বিশেষজ্ঞরা সে তথ্যই উদ্ঘাটন করেছেন। আমাদের দেশে ঠিক যেমন করে এসে-ছিল যুগল উপাসনার ধারা—শিব-দুর্গা (শিবশক্তি), লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি। ভারত ছাড়িয়ে পৃথিবীর অনেক দেশেই এই যুগল উপাসনা ছিল। মিশরে এমনি যুগল দেবতার নাম আইশিস-ওসিরিস। মেসোপটেমিয়ায় তাঁদের নাম তিস্নামৎ-তাপসু। উত্তরভারতের রাম-সীতাও প্রচণ্ড আবেগে পূজিত যুগল পূজোর নিদর্শন। একালের পণ্ডিতরা এই যুগল উপাসনাকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, এ হোল যৌনাচারকেন্দ্রিক এক ধর্ম ভাবনার রূপ। কেউ বলেছেন, ত র মূলে আছে উর্বরতাবাদের ধর্ম সাধনার ধারা। বাংলাদেশে অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই ধরণের যুগল ধর্মধারা প্রবল হয়ে উঠেছিল। আমাদের প্রাচীন মন্দিরের গায়ে কিংবা পাহাড় ও গুহার চিত্রে এই ধরণের যুগলবন্ধ মূর্তি লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং বুড়োবুড়ি উপাসনায় যেমন আছে অলৌকিক কিছু জাদুবিশ্বাস, প্রাচীন প্রস্তর পূজোর এবং উর্বরতাবাদ বা যৌনাচারের স্বাক্ষর, তেমনিই আছে প্রত্নমানুষ পূজোর ঐতিহ্য ॥

ননদ-ভাজ

মানব সমাজে দুটি মধুর সম্পর্ক ননদ ও ভাজ। স্বামীর বোন ননদ। এবং দাদা বা ভাইয়ের স্ত্রী ভাজ। লৌকিক জীবনের প্রাচীন ইতিহাসে ননদ ভাজের সম্পর্ক বেশ প্রীতিময় ছিল না। সেকালে যে-বালিকা বধূরা শ্বশুর বাড়ীতে আসতো, কি জানি ননদিনীরা তাদের খুব একটা দেখতো না সুনজরে। শাশুড়ি

ননদে মিলে বধূ-গঞ্জনা ছিল সেকালের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। ননদ-ই যে বধূর যন্ত্রণার কারণ ছিল, আমাদের লৌকিক ব্রত কিংবা ছড়াগানগুলি তার প্রমাণ দেয়।[১] গ্রামাঞ্চলে এখনো ননদী ও বধূর পারস্পরিক বিবাদ বিলুপ্ত হয়নি। ননদ-ভাজ এই যুগ্ম নামের উচ্চারণ মাধুর্য যতটুকু, ততটুকুই এর অন্তরে বেদনা ছিল জড়িয়ে। অথচ এই নামেই এক গ্রামদেবতা আছেন বাঁকুড়া জেলার সাতপাটার পাশে দেমুসনা গ্রামে। বাঁকুড়ার দক্ষিণে রাইপুর থানা। তারও দক্ষিণে মণ্ডল-কুলি গ্রাম। তার পাশেই দু' মাইল হাঁটা পথে দেমুসনা গ্রাম। বর্ষা ছাড়া অন্য সময় সাইকেলে যাওয়া যায়। গ্রামের পশ্চিম দিকে বিরাট পুকুর 'বড়মুন্না'। এই পুকুরের ঈশান কোণে একেবারে পুকুরের ভেতরে ননদ-ভাজের দুটি লাগোয়া প্রতীক। দুটিই বড় 'পচা পাথর'। সবুজ রঙের একশ্রেণীর পাললিক প্রাচীন শিলাকে পচাপাথর বলে এ অঞ্চলে। দক্ষিণ বাঁকুড়ার খাতড়া, সুপুর, রাইপুর, সিমলাপাল, ফুলকুসমা প্রভৃতি অঞ্চলে এবং মেদিনীপুরের বিনপুর থানার শিলদা, বেলপাহাড়ী, সাতশোল্যা প্রভৃতি অঞ্চলে এরকম পাথর প্রচুর মেলে। দেমুসনার বড়-মুন্না পুকুরে ননদ-ভাজের প্রতীক শিলাদুটির একটি আছে খাড়া হয়ে, তার মাপ ৬´×৮ ফুট; অপরটি আছে পাড়ে। তার মাপ ৫´×৭´ ফুট। লোকে বলে একটি আছে শুয়ে আর অপরটি আছে তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে। কেউ কেউ বলে, শুয়ে থাকাটা বধূ আর দাঁড়িয়ে থাকাটা ননদ।

বিপরীত মন্তব্যও শোনা যায়। তবে এদুটি শিলায় কোনো মূর্তিই আঁকা নেই। পুকুরটির উত্তর দিকের পাড়ে একসময় একটা প্রাচীন বটগাছও ছিল। এখন একটি নতুন চারা বটগাছ আছে। এখন তার তলাতেই থান হয়েছে ননদ-ভাজের। এখানে এক ধাপ ইঁটের ওপর আছে কিছু নতুন-পুরোনো হাতি-ঘোড়া। লোকের ধারণা, গ্রামদেবী ননদ-ভাজ অধিষ্ঠান করেন এখানেই।

দেমুসনার পাশেই সিমলিগ্রাম। এখানের চক্রবর্তী উপাধির রাঢ়ী ব্রাহ্মণেরা

---

১. টুসু গানে: দুন্যার পাপী ননদী মাগী তার কি মরণ হয় না॥
খাবার বেলা খবর আল্য তর ননদী মরছ্যে॥
ননদ মরল ভাল হল পেটের ভাত জিরুন গেল।
ছুটবেলায় সাঁতাইছিল তাই হঁতে যমে লে গেল॥

এখনো অবিবাহিত-কন্যা তার বাপের বাড়িকে নিজস্ব সম্পত্তি বলে মনে করে, ও বধূর আগমনকে ভাবে, তার অনধিকার প্রবেশ বলে। তা থেকেই জন্মে অত্যাচার করার প্রবণতা। ফলে সে বধূর বিরুদ্ধে দাদা বা ভাই, মা বা বাবার সঙ্গে নানা সত্যামিথ্যে অভিযোগ তোলে।

আছেন বেশ ক' ঘর। তাঁরাই পালা করে পুজো করছেন ননদভাজের।[১] পুরুষানুক্রমেই তাঁরা পুজো করেছিলেন। কালের ব্যবধানে অনেকটাই লোপ পেয়েছে ননজ-ভাজের পুজো। ফলে অনেকদিন আগেই উঠে গেছে নিত্য পুজো। গ্রাম্য-জমিদারের দেওয়া সম্পত্তিও বিলুপ্ত হয়েছে নানা কারণ। এখন বছরে একদিন তাঁর পুজো হয়। সে হল পয়লা মাঘ, 'এখ্যানে'। দেমুসনা, সাতপাটা এবং আরো পাশাপাশি কিছু গ্রামে মাঝি, লোহার, সদগোপ, গোয়ালা, দুলে, মাল. ও শিকরা প্রভৃতি নানা জাতি-উপজাতির লোকেরা এদিন তাঁর পুজো দেন। সাঁওতালেরাও অনেক সময় পুজো দিয়ে গেছেন। সামান্য পান্তাভাত এ-পুজোর প্রধান নৈবেদ্য। সেটা দেন পুজারী নিজেই। অন্যান্যরা দেন দুধ-চিড়ে-চিনি এবং অন্য সব সাধারণ নৈবেদ্য। এখানেও ধূপ-দীপ জ্বলে, শাঁখ বাজে। নতুন করে বাঁধানো বেদীতে নতুন হাতিঘোড়াও স্থাপিত হয়। আগেকার দিনে লাগতো এক কুড্যা পান্তাভাত। যা, এয়োতিরা ভোগ হিসেবে থানেই হাত পেতে নিতেন মাথায় ঠেকাতেন।

ননদ ভাঁজের সম্পর্কেও বিচিত্র জনশ্রুতি। পরস্পর বিরোধী লোককাহিনীও বেশ আছে। একটা জনশ্রুতিতে শোনা যায়ঃ একসময় এক নতুন বৌ স্বামী শাশুড়ির অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে ওঠে। এই পুকুরে সে করে আত্মহত্যা। ননদী তাঁকে বাঁচাতে আসে। তাকে টেনে তুলতে গিয়ে দেখে, বৌ মারা গেছে এবং তাকে ছোঁয়া মাত্রই ননদীও পাথর হয়ে যায়। তারপর বৌটির স্বামীর সংসারে উপদ্রব শুরু হয় ভূতের। মরতে থাকে লোকজন, ছাগল-ছোঁড়। ক্রমেক্রমে সারা গাঁযে এই উপদ্রব দেখা দেয়। দেখা দেয় বসন্ত, মাহামারী, আর সেই সঙ্গে ঝড় ও বৃষ্টি। গুণীণরা পরামর্শ দেন ননদ-ভাজের পুজার্চনা করতে। গ্রামবাসীর পুজোয় তুষ্ট হয় ননদ-ভাজের অশরীরি আত্মা। চলু হয় ননদ-ভাজ পুজো।

আর এক জনশ্রুতিতে পাই, মায়ের অত্যাচার থেকে নতুন বৌকে রক্ষা করতে চেয়েছিল ননদী। কিন্তু মা তাতে এমনি রুষ্ট হয় যে এদিন পিটিয়ে মেরে ফেলে বৌকে। তখন ননদটিও আত্মহত্যা করে পুকরের জলে ডুবে। ননদ-ভাজের এই অকৃত্রিম ভালোবাসাকে শ্রদ্ধা করতে থাকে বৌয়েরা। এবং সেই শ্রদ্ধাই ক্রমশ রূপ নেয় পুজোয়। ননদ-ভাজ উন্নীতহন দেবতায়।

এ-পুজোর প্রধান উদ্দেশ্য সাংসারিক অশান্তি দূরীকরণ। লোকের বিশ্বাস, তাঁর পুজো দিলে পুরনো বিবাদ মেটে, শান্তি আসে সংসারে। রোগ- শোক- অকালমৃত্যু রোধ হয়, বসন্ত বা মহামারী হয় না। দেমুস্নাবাসীদের দাবী,

---

১. লেদু ঠাকুর (চক্রবর্তী ৫০),

এ গ্রামে এখনো ঘটে নি কোনো মহামারী বা কঠিন বসন্ত। তাঁরা আরো বলেন, ননদ-ভাজের রুদ্ররোষ পড়েছিল এগ্রামের চারটি সম্প্রদায়ের ওপর। তাঁরা হলেন—কামার, কুমোর, তাঁতী ও চিঁড়েকোটা মাঝি। কারণ, এ সম্প্রদায়ের বৌদের উৎসাহেই মৃত্যু ঘটেছিল বৌটির। স্বপ্নাদেশ হয়েছিল, গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে এই চার সমাজকে। এবং নিষেধ করেছিল, থাকলেও তাঁরা নিজ নিজ জীবিকায় লিপ্ত হবেন না। এখনো সেই চার জাতি আছেন। কিন্তু কর্মকার শাল করেন না, কুমোর হাঁড়ি গড়েন না, তাঁতী তাঁত চালান না, মাঝিরা চিঁড়ে কোটেন না। এসব জিনিস এ গ্রামবাসী আনেন অন্য গ্রাম থেকে। অন্য গ্রামের এই নামের চার সম্প্রদায় এখনো এ গ্রামের কারো বাড়িতে ভাত খান না। সেকালে ভিনগ্রামবাসীরা এ গ্রামে জলও খেতেন না।

গল্প আছে আরো। ননদ-ভাজের এই পুকুর বড়মুন্নো। এ-পুকুরে নানা প্রয়োজনে প্রার্থনা মতো ভেসে উঠতো বিচিত্র বাসন-কোসন। শ্রাদ্ধ বা অন্নপ্রাশনে আগের দিন সন্ধ্যেবেলায় ননদভাজের থানে জ্বালতে হতো প্রদীপ। প্রার্থনা করতে হতো প্রয়োজনীয় বাসনকোসন। পরদিন ভোরে ঘাটে দেখা যেত ঠিক ততগুলিই বাসন জমা আছে। কাজের শেষে সেগুলি ফেরৎ দিতে হতো সন্ধ্যেবেলায়। একবার এক ব্যক্তি 'কি হয়' বলে একটা ছোট বাটি ফেরৎ দেয় নি। সেই থেকে নাকি বাসন ওঠা বন্ধ হয়েছে। এ গল্পের সঙ্গে মিল নেই ননদভাজ কাহিনীর। মনে হয় পুকুর কিংবা দেবতার মাহাত্ম্য বৃদ্ধিতেই এই ঘটনার সৃষ্টি। ননদ-ভাজ গল্পটিও ননদিনীর গৌরব সৃষ্টিতে কল্পিত হতে পারে। বধূ নির্যাতনের পরিপ্রেক্ষিতে ননদের এই গৌরবগাথা যথেষ্ট মনস্তাত্ত্বিক উৎকর্ষের প্রমাণ দেয়। বর্তমান পুজোর মূলে পূর্বপুরুষ পুজোর সূক্ষ্ম ইঙ্গিত থাকাই সম্ভব। তার সঙ্গে মিশেগেছে বিচিত্র জাদুবিশ্বাস ও ততোধিক বিচিত্র কিছু সংস্কারও ॥

ভাসুর-বুয়াসিন

গ্রামের নাম থুমপাথর। ভারি আশ্চর্য নাম। বাঁকুড়া জেলার ছাতনা থানার এই গ্রাম। শুশুনিয়া-পাহাড় থেকে মাত্র দু মাইল পশ্চিমে। মনে হচ্ছে পাহাড়টা যেন নীল হয়ে উঠেছে এ গ্রামের সীমান্ত থেকে। চারদিকে হাঁসা (শাদা) পাথর। এখানে ওখানে শাদা ধপধপে পাথরের চাঁই। মাঝে মাঝে অগুণতি পাথরের স্তূপ। [illegible] গড়া। লাল কাঁকর মাটি। ডুংরির দাড়াং ও অদূরে বিরাট চাল। চাল মিশেছে এক [illegible]ভূমিতে। মাঝেমাঝে চাষের

ক্ষেত। সুতোর মতো রাস্তা। কেঁদ ঝোড়, বেগুন্যা-লাটা আর খেজুর ঝোপের মধ্যে রাস্তা যেন হারিয়ে যায়। তাই দিয়ে যেতে হয় থুমপাথর গ্রামে। খুব ছোট্ট গ্রাম। নিতান্ত ক ঘর দরিদ্র মানুষের আস্তানা। জনসংখ্যা তিনশোর বেশি নয়। প্রায় সকলেই তথাকথিত বাউরি সমাজের মানুষ। কিন্তু সকলেরই জীবিকা দিনমজুর নয়। অনেকেই জীবিকা অর্জন করেন সত্যনারায়ণের পাঁচালী গেয়ে। কারো কারো দারুণ স্মৃতিও দেখলাম।

গ্রামের বাইরে, যেখানে দু চার ফালি ছোটো ছোটো ধান ক্ষেত, আর তাদের উত্তর পূব দিকে অনন্ত পাথরের স্তূপ, সেখানে কিছু ধানজমির মাঝে সামান্য তড়া (অনাবাদী) জমি। সেই তড়ায় পাশাপাশি পোঁতা দুই আশ্চর্য শিলা। দুটিতে রহস্যময় মূর্তি আঁকা। একটি শিলা ৪´×২½´ ফুট। এটি খাড়া ভাবে পোঁতা, যেন সোজা দাঁড়ানোর ভঙ্গি। অন্যটি ৪´×২´ ফুট। এটি বড় পাথরটির দিকে কিছুটা হেলানোভাবে পোঁতা, অথবা খাড়াভাবে থেকে হেলে গেছে কিছুটা। দুটির গায়েই দুই বীর মূর্তি ক্ষোদিত। জনসাধারণ এই শিলাকেই পুজো করছে গ্রামদেবতা 'ভাসুর-বুয়াসিন' বলে, তাদের গ্রামেরই জীয়ন্ত নর-নারীর প্রতীক মনে করে। কল্পিত হয়েছে খাড়া শিলাটি ভাসুর, হেলানো শিলাটি বুয়াসিন। বুয়াসিন যেন ভাসুরকে আড়নয়নে দেখে পালিয়ে যাচ্ছে দ্রুত।

হিন্দুসমাজে পারিবারিক নানা সম্পর্ক আছে। স্বামীর দাদাকে বলে ভাসুর, ভাইকে বলে দেওর। উল্টে দাদার স্ত্রীকে বলে বৌদি, ভাইএর স্ত্রীকে বলে ভাদ্র-বধূ বা বুয়াসিন। বৌদির সঙ্গে দেওরের সম্পর্কটি বেশ মধুর। কিন্তু বুয়াসিনের সঙ্গে ভাসুরের সম্পর্ক যেমনি কঠিন, তেমনি অপ্রত্যাশিতও। ঘন্টার পর ঘন্টা হাসি ঠাট্টা গান গল্প করবে বৌদি-দেওরে। কিন্তু বুয়াসিনের সঙ্গে কথা বলাই নিষিদ্ধ ছিল সেকালের সকল হিন্দু সমাজেই। সেখানে ভাসুরের গা কোনোক্রমে ছোঁয়া গেলে বুয়াসিনের লজ্জা ও তিরস্কার সমান ভাবে প্রাপ্য ছিল। কল্পনাতীত ছিল পরস্পরের কথাবলা, হাতে হাতে কোনো জিনিস দেওয়া, এমন কি মুখ দেখানো।

কিন্তু সমাজ শাসন এক, মন বস্তুটা আর। এমনি সমাজেই অনেক সময় বুয়াসিনে ভাসুরে অবৈধ দেহ সম্পর্কও গড়ে উঠেছে নানা কারণে। অনেক সময় ভাসুরই কৌতূহলী হয়েছে ভাদ্রবধূর সম্পর্কে। স্বামীর অন্যত্র গমন বা বস-বাসের জন্যেও বুয়াসিন ভাসুরের সঙ্গে অবৈধ সম্ভোগে লিপ্ত হয়েছে। ভাসুরও তেমন অবস্থায় বুয়াসিনকে নামিয়ে এনেছে হীনপথে। প্রায় সব দেশের লোক-গাথা বা লোকগল্পে তেমন কাহিনীর সন্ধান মেলে। পশ্চিমসীমান্ত বাংলার টুসুগানে আছে তেমনি কিছু কলি—'বাড়ি নামর লাহেড়ে বুনাম লাহেড়ে হল্য

চমৎকার। কলের পুরুষ (স্বামী) চাকরি গেল, ভাসুর হল্য গলার হার।' এ অঞ্চলের লোককথায় আছে ভাসুরকে নিয়ে বয়্যাসিনের গ্রামত্যাগ বা বয়্যাসিনকে নিয়ে ভিনদেশে গিয়ে ভাসুরের ঘরবাঁধার চমৎকার সব গল্প। সমাজজীবনেও এ ঘটনা অপ্রতুল নয়। বিশেষত তথাকথিত নিম্নসমাজে এ ঘটনা কম ঘটেনি। বর্তমান শিলাদুটিতে ভাসুর বয়্যাসিনের এমনি এক অবৈধ দেহমিলনের সম্পর্ক কল্পিত হয়েছে। এবং এমনি অবৈধ সম্পর্ককে শেষপর্যন্ত চাপা দিতে প্রলেপ দেওয়া হয়েছে ধর্মবিশ্বাসের। অসামাজিক প্রেমের নায়ক-নায়িকাকে পরিণতি দেওয়া হয়েছে একেবারে গ্রাম্য-দেবদেবীতে। যেমনটা ঘটেছে লোকসাহিত্যের রাধাকৃষ্ণের অবৈধ প্রণয়কাহিনীতে। একান্ত লৌকিক দুই নরনারী একসময় হয়ে উঠেছে আরাধ্য দুই দেবদেবী। এমন অবৈধ কাহিনী প্রচুর আছে রামায়ণ মহাভারত কিংবা পুরাণেও।

থুমপাথরের গ্রামবৃদ্ধেরা বলেন এক মজার কাহিনী : অনেকদিন আগের কথা। ভিন গাঁ থেকে এসেছিল একটি নারী ও একটি পুরুষ। তারা আশ্রয় নিয়েছিল এ গ্রামে। কুঁড়ে বেঁধেছিল এখানের এই মাঠে। বেশ কদিন তারা ভালোই ছিল। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যেবেলায় একদল লোক এসে তাদের করলে আক্রমণ। নারী ও পুরুষটিকে তারা মারতে লাগলে বেপরোয়া। মারতে মারতে মারা গেল পুরুষটি। তখন এ গ্রামের অধিবাসীরা ছুটে এসেছে। জিজ্ঞেস করে তারা জানতে পারলে পুরুষটি ছিল নারীটির ভাসুর। তার স্বামী গিয়েছিল পূবদেশে। নারীটির প্রতি অনুরক্ত হয় ভাসুরটি। এবং একদা রাতে তারা বাড়ী ত্যাগ করে চলে আসে এখানে। কদিন পরে বাড়ি ফেরে স্বামী। সে অনুসন্ধান করে। জানতে পেরে এখানে সে আসে দলবল নিয়ে। ক্রোধে উন্মত্ত হয় দলটি। সেই নারী ও পুরুষটিকে তারা মারধোর করে প্রচন্ড। পুরুষটি মারা যায়। কুলটা স্ত্রীকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলে স্বামীটি। তারপর তারা চলে যায় গ্রামে। শুরু হয় ভূতের উপদ্রব। শেষ পর্যন্ত গ্রামবাসী কবর স্থানে গিয়ে ভাসুর-বয়্যাসিন-কে পুজো দেয়। পুজোর পরেই গ্রামে উপদ্রব বন্ধ হয়। উপরন্তু সে বছর হয় প্রচুর শস্য। সেই থেকে ভাসুর বয়্যাসিন পুজোর চল্ হয়েছে। অর্থাৎ এই লোকগল্পটি বলতে চায়, এ-পুজোর মূলে আছে মানুষ পুজো, পূর্বপুরুষ পুজো। বর্তমান শিলা দুটি তারই স্মারক।

কিন্তু শিলাদুটি নিতান্ত সাধারণ শিলাও নয়। দুটিরই গায়ে আঁকা দুই বীর মূর্তি। যাকে বলা হয়েছে 'ভাসুর'-শিলা, তার গায়ের বীরমূর্তিটি প্রায় আড়াই ফুটের। তার ডান হাতে তলোয়ার, বাঁ হাতে ধনুক। হাঁটার ভঙ্গিতে বাঁ পা কিছুটা উপরে ওঠা। যাকে বলা হয়েছে 'বয়্যাসিন'-শিলা, তাতেও আঁকা

আরেক বীর মূর্তি, সেও প্রায় দু ফুট, সেও আছে ছোটার ভঙ্গিতে পা তুলে। তার ডানহাতে তীর, বাঁ হাতে ধনুক। এ অঞ্চলে তীরকে বলে 'কাঁড়', ধনুককে বলে 'কাঁড়বাঁশ। বুয়াসিন শিলায় এই মূর্তিটির পায়ের কাছে আরেকটি মূর্তি, তাও অন্তত দশ ইঞ্চি, তবে বড় অস্পষ্ট। গ্রামীবাসীরা বলেন, আর একটি ছোট শিলা ছিল এ দুটি শিলার মাঝে, যেখানটাতে কিছুটা ফাঁকা দেখা যাচ্ছে। তাতে উৎকীর্ণ ছিল কিছু লিপি। মাত্র ক বছর আগে (১৯৭০ খৃীঃ) সেটা চুরি গেছে এক বাবু দেখে যাবার পরই। কিন্তু কোন্ বাবু, তাঁর নাম বলতে পারলেন না তাঁরা। লিপিটার জন্যে গ্রামবাসীর থেকেও আমার দুঃখ কম হলো না। সেটি থাকলে জানা যেতো নতুন অনেক কিছুই। মিলে যেতে পারতো শিলা স্থাপনের ইতিহাস। যেমনটা মিলেছে শুশুনিয়া-পাহাড়ের গায়ে মহারাজা চন্দ্রবর্মার শিলালিপিতে। হয়তো থুমপাথরের এই লিপিতে মিলতো চন্দ্রবর্মারই আরেক কীর্তি।

কোনো পাথরে কিছু খোদাই, বস্তুত এমন চমৎকার খোদাই শিলাসৃষ্টির সার্থক নিদর্শন তো বটেই, এমনটি স্থাপনের গৌরবও জড়িয়ে আছে এর গায়ে। তবে এমন শিলা স্থাপনের দুটি উদ্দেশ্যের কথা শোনাযায়। সেকালের রাঢ়ের জমিদাররা ছোটো ছোটো রাজ্য বা জমিদারী এমনকি মৌজা জয়েরও আনন্দ প্রচার করতেন। জয় করা স্থানের সীমান্তে পুঁতে দিতেন এমনি সব শিলা। এগুলিকে তাঁরা বলতেন 'জয়স্তম্ভ' বা বীরস্তম্ভ। আবার নিজ নিজ রাজধানীতেও এমনি স্তম্ভ বা শিলা তাঁরা পুঁততেন বিজয়ের সাক্ষী হিসেবে। এক একটা নতুন স্থান বা জমিদারী দখলের নিদর্শন এগুলি।[১] ছাতনার কামারকুলিতে একটি পুকুরের পাড়ে এরকম শিলা আছে ৪টি, ছাতনারই জিড়রা গ্রামে আছে ১টি। তন্মধ্যে জিড়রা-শিলাটি পূজিত হচ্ছে গ্রামঠাকুর 'খুদ্যানাড়া' নামে। ছাতনার শিলাগুলিও যে কখনো ফুলজল পায়নি, এমন নয়।

কোনো কোনো পণ্ডিত এমন খোদিত শিলাকে বলেছেন, সেকালের মুণ্ডা বা ভূমিজ সম্প্রদায়ের সমাধিপ্রথার নিদর্শন। রিসলে এ-নিয়ে তথ্যও সরবরাহ করেছেন নানাবিধ। নানা সময়ে প্রত্নতত্ত্ববিভাগও উদ্ধার করেছেন বিভিন্নস্থানের ভূমিজীয়-সমাধি ক্ষেত্র সম্পর্কিত বিবরণ। বাঁকুড়া পুরুলিয়া জেলায় ও ঝাড়গ্রাম মহকুমায় এমন সমাধি ক্ষেত্র ছিল প্রচুর। বিশেষজ্ঞের মতে, এ হলো মেগালিথিক সংস্কৃতির নিদর্শন।[২] কিন্তু স্থানীয় বৃদ্ধরা পারেন না অন্য তথ্য বলতে। তবে

১, সাক্ষাৎকার ২৭.১২.১৯৭৮—ছাতনার সর্বশেষ রাজা শ্রীহেমেন্দ্রলাল সিংদেও (৭২) ১০.১০.১৯৭০—রসপালের রাজা শ্রীবিদ্যানিধি নারায়ণ দেউ (৭০)।

২. বিনয় ঘোষ : পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (১৯৭৬) পৃ ৪৩৩

ভূমিজদের সমাধি পুজোয় নিদর্শন হলেও, এ শিলা দুটি পূর্বজ নরনারী পুজোকেই স্মরণ করায়। কিন্তু এঁর পূজক বাউরি সম্প্রদায়। জীবন ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে ভূমিজ ও বাউরি অনেকটাই অভিন্ন।

বাঁকুড়ার এক পন্ডিত বলেছিলেন অন্য তথ্য। এগুলি 'যজ্ঞস্তম্ভ'। 'থুমপাথর' শব্দের উৎস সংস্কৃত 'স্তোম প্রস্তর'। স্তোম মানে যজ্ঞ। প্রাচীনকাল নানা বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান হতো শুশুনিয়া অঞ্চলে। শুশুনিয়ার চট্টোপাধ্যায় পদবীর ব্রাহ্মণেরা ছিলেন তার পুরোহিত। এক একটি বড়ো বড়ো যজ্ঞের নিদর্শন এ সব বীর-মূর্তি অংকিত শিলা।[1] কিন্তু যজ্ঞবিষয়ক কোনো প্রমাণ মেলেনি এদেশের আর কোথাও।

থুমপাথরের শিলাদুটি পুজিত হচ্ছে গ্রামঠাকুর 'ভাসুর-বুয়াসিন' নামে। গ্রাম সীমান্তে (পূর্বাংশে) এগলি পোঁতা। কাশ্যপ গোত্রের গোবরা থাকের বাউরিরা এঁর পুজারী বা পুরোহিত।[2] সম্ভবত এঁরা সত্যনারায়ণের গান করে জীবিকা অর্জন করেন বলেই গায়েন। এদের পদবী গায়েন। সংক্রান্তি ধরে এঁর পুজো। বার্ষিকী পুজো ১ মাঘ। পুজো দেন গ্রামের সকল মানুষই। ভোগ হয় গুড় দই চিঁড়ে দিয়ে। পুজোর দিন উপোস থাকেন ঘর প্রতি একজন করে। বলি হয় না কোনো পশু বা পাখি। তবে বাজনা লাগে। ডোমের বাজনাই চলছে পুরুষানুক্রমে। পুরুষানুক্রমেই বাজনা বাজাচ্ছেন নিকটবর্তী কুল্যাড়া গ্রামের ডোমেরা। বৈশেখ মাসে এ দেবতার নামে হয় চব্বিশ প্রহর—হরিনাম সংকীর্তন। এ সময় তিনদিন ধরে পরব চলে চমৎকার। এ উৎসব সংস্কৃতি সমন্বয়ের চমৎকার নিদর্শনও। বৈষ্ণব ধর্মের মূল কথা নামসংকীর্তন। পশ্চিমরাঢ়ের এই পান্ডব-বর্জিত দেশেও যে চৈতন্য-ধর্ম প্লাবন এনেছিল, এ তারও প্রমাণ। সেকালের ভূমিজ বাউরি সর্দার জেলে প্রভৃতি জাতিও মান্য করেছিল চৈতন্য ধর্মকে। ভাসুর-বুয়াসিন দেবতাও অধিক মান্য পেয়েছিলেন এ উৎসবের সংযোজনে।

গ্রামবাসীর নানা বিশ্বাস এ দেবতার সম্পর্কে। তাঁরা একে মানেন তিনি শস্যদেবতা বলে। তাঁর পুজো দিলে উৎকৃষ্ট বৃষ্টি হয়, ধান জম্মায় যথেষ্ট। তিনি শুধু ধান দিয়েই ক্ষান্ত নন, তিনি ফসল রক্ষাও করেন। তবে গ্রাম নারীদের ধারণা তিনি সন্তানদাতাও। 'আকাট বাঁজি পায় পুত' এ বিশ্বাস সরলমতী গ্রাম্যদিদিমার।

উত্তরবঙ্গের কোনো কোনো স্থানেও 'ভাসুর-ভৈসিন' পুজো হয় খড়ের আঁটি

১. অধ্যাপক শ্রীসুখময় চট্টোপাধ্যায়, বিদ্যারত্ন (৭০)
২. শ্রীসন্তোষ গায়েন (৪০)

দিয়ে। ঠিক পুতুলের মতোই তাঁর প্রতীক। তবে ভাস্কর-বুয়াসিন যে আদিম যৌনাচারের নিদর্শন, তাও অনস্বীকার্য। প্রায় সব দেশেই যৌনপ্রতীক উপাসনার স্বাক্ষর আছে। কিন্তু চালিত গল্পানুসারেই এ দেবতাকে পূর্বপুরুষ পুজো বলতে হয়। দেশজ বা স্থানীয় গল্প ছাড়া অন্য পথ প্রশস্ত নয়। তবে সমাধি প্রথার প্রসঙ্গ তুললে এ দেবতা যথার্থই আদিম মানুষ পুজোর নিদর্শন।।

খঁকাখুঁকি

বাঁকুড়া জেলার মেদিনীপুর গ্রাম। নামের ভারি আশ্চর্য যোগাযোগ। ওঁদা থানার এ এক ছোট গ্রাম। ওঁদা থেকে হাঁটা পথ ৫ কিঃ মি দক্ষিণে। সম্প্রতি বাসপথ হয়েছে ২ কিঃ মি দূরের কৃষ্ণপুর দিয়ে। কিন্তু সর্বদা বাস চলে না। ফলে যোগাযোগ বলতে সাইকেল কিংবা রিকসো। মাঠদিয়ে গেলে পেরোতে হবে নদীনালা মাঠখেত। গ্রামের উত্তর সীমায় হরিন্যাবাদ মৌজা। চলতি নাম 'হন্নাবাদ'। এখানে আছে 'মুলখা' নামে একটা খুব পুরোনো পুকুর। তার পশ্চিমপাড়ে বিখ্যাত গ্রামদেবী কালীভবানীর মন্দির। মন্দিরের পাশেই 'খঁকা-খুঁকি' দেবতার থান। চারদিকে চল্লা আঁকড়্যা বাঁশ নিম প্রভৃতি বিবিধ ছোটোবড়ো গাছের সমারোহ। ওদিকে মুলখা পুকুরে শালুক ফুলের ছড়াছড়ি। পুরোনো 'দল' জল ভেদ করে উঠছে পুকুরে। চারদিক ঘিরেই বিস্তৃত ধানক্ষেত। কালী-ভবানীর পুরোনো মন্দির ভেঙে গেছে বহুদিন আগেই। তা নাকি নির্মাণ করেছিলেন বিখ্যাত পুজারী কৃষ্ণশর্মা। মন্দিরের মধ্যে কালীভবানী ছাড়াও আছেন চার দেবদেবী—হাঁড়াদেবী, জটাধারী, হীরালাল সন্ন্যাসী ও মনসা। এখানে শেষদিকে জমিদার ছিলেন জগজীবন ধল্লবাবু। অম্বিকানগর রাজ এস্টেটের সঙ্গে তাঁদের ছিল ঘনিষ্ট যোগাযোগ। ৮ শতক দেবোত্তর তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন দেবদেবীর নামে। সে দলিল এখনো আছে। জে. এল. নং ১৭৭, খ. নং ৫৭৩, তাং ৮. ১১. ১৯৪৪। তাঁরই উদ্যোগে নির্মিত হয় বর্তমান মন্দির, যাত্রীনিবাস ও কৃষ্ণশর্মার সমাধি। এই সমাধির পাশেই গ্রামদেবতা খঁকাখুঁকির সুপ্রাচীন থান। লোকে বলে, এ অঞ্চলে খঁকাখুঁকিই প্রাচীন দেবতা। এখন প্রাধান্য হারিয়েছেন তিনিই বেশি।

তাঁর প্রতীক হাতিঘোড়া। হাতি ৮টি, প্রতিটিই প্রায় ১½ হাত করে উঁচু। এগুলির দু-পাশে আছে দুটি ঘোড়া। ঘোড়ার উচ্চতাও প্রায় ২ হাত। এসব পাঁচমুড়ার তৈরী। তবে স্থানীয় তৈরী ছোটো ছোটো প্রচুর হাতিঘোড়াও আছে চারদিকে। মনসা-বারির মতো দুটি ঘটও আছে সবচেয়ে নিচে। এই ঘটেই

পুজো হয় সকলের আগে। পুজারীর মতে, এগুলিই খঁকাখুঁকি ঠাকুরের আসল জিনিস।

কালীভবানীর মন্দির সামনেই। এ মন্দির পূবমুখী। এর পশ্চিম দেওয়ালে আছেন অন্যান্য দেবদেবীদের প্রতীক। দক্ষিণ পশ্চিম কোণে হাঁড়াদেবী। তাঁর প্রতীক ধাতুর তৈরী একটি হাঁড়ি। বাঁকুড়া অঞ্চলে বড় হাঁড়িকে বলে 'হাঁড়া'। মনসার প্রতীক সাপযুক্ত মাটির বারি। এমন বারি ১৪টি। সিংহাসনে আছেন কালীভবানী। তাঁর প্রতীক দুটি ঘোড়া। এরপর আছে বহু ছোটোবড়ো হাতিঘোড়া। এগুলির মধ্যেই আছেন হীরালাল সন্ন্যাসী। থানে আছেন পঞ্চম এক দেবী। তিনি আছেন হাতির পিঠে বসে, সাপ আছে তাঁর মাথার ওপর, তাঁর পায়ের কাছে। হাত আছে দুটি। নাম না থাকলেও বুঝি ইনিও মনসা।

পুজো করেন শর্মা পদবীর রাঢ়ী ব্রাহ্মণ[১]। তাঁরা থাকেন গ্রামেই। নিত্য-পুজো কালীভবানীর। তাঁর সঙ্গেই পুজো পান অন্যসব দেবদেবীরা। কালী-ভবানীর পুজো দক্ষিণাকালীর ধ্যানে—'ওঁ করালবদনাং ঘোরাং' ইত্যাদি মন্ত্রে। কিন্তু খঁকাখুঁকির পুজো নিত্য নয়। যাত্রী এলেই তাঁর পুজো। তবে এঁর কোনো মন্ত্রও নেই। খেলনা তাঁর প্রধান উপচার। তবে দুধ ঘি চিনি চাল যে কেউ দিতে পারেন তাঁর পুজোয়। চাঁদমালা ফুলঘরা থেকে মাটির বা কাঠের এমন কি মোমের খেলনা দেবারও চল আছে। বার্ষিকী হয় কালীভবানীর সঙ্গেই দশহরা ও তার পরের দিন, দুদিন ধরে। তাঁর ঘট আসে নিকটের তড়ার বেন্যা নামের পুকুর থেকে। ঘটও আসে কালীভবানীর সঙ্গেই। তারপর ষোড়শ উপচারে পুজো। কালীভবানীর নামে পাঁঠা বলি। তবে প্রথমে পুজো পান কালীভবানী।

পুজোর দিন ভক্তরা কৃচ্ছ্রসাধনাও করেন। পুজো দিতে আসেন পাশের সব গ্রামের লোকেরাই। মেলাও বসে বার্ষিকীতে। একসময় শিশুদের ভালো লাগে এমন জিনিস এ মেলায় বিক্রী হতো। লোকজন আসত ওঁদা রামসাগর লোদনা বোলাড়া বিষ্ণুপুর জয়পুর কুচেকোল থেকেও। এখন মেলা হয় না। ভীড় জমে সন্ধ্যায়। পুজোর পর আগুনসন্ন্যাস হয়। ৬টি জুলিতে তৈরী হয় ঘসঘসে কাঠ-কয়লার আগুন। মানসিক যাঁদের থাকে, তাঁরা চলেন সেই আগুনের ওপর। যাঁর যেমন মানসিক, তিনি চলেন তেমনি। কেউ চলেন পা-পা করে, কেউ চলেন ঝাঁপ দিয়ে। দশহরার পরদিন 'ভাঁড়াল'। ভাঁড়াল খঁকাখুঁকির নিজস্ব পুজো। ভাঁড়াল দেওয়া হয় একবোতল মদ দিয়ে। গ্রামেরই জনৈক ধীবর সম্প্রদায়ের

---

১. পুজারী শ্রীপণ্ডিত শর্মা (৪৫)। এঁরই ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা কৃষ্ণশর্মা। তিনি ছিলেন ভূতসাধক। তিনিই প্রসার করে ছিলেন এখানের পুজোর।

ব্যক্তি, বরাবর তিনিই দিচ্ছেন এই ভাঁড়াল।[১] ভাঁড়াল পূজোর পরই সেকালে অনুষ্ঠিত হতো শিশুদের নাচ। নাচের পরেই তাদের বিলানো হতো মিষ্টি ভোগ। এ সবের খরচ দিতেন স্থানীয় ভূস্বামী। জমিদারী বিলোপের পর দুচার বছরের মধ্যেই বন্ধ হয়ে গেছে ভোগ বিলি। শিশুরাও আসে না এখন। এখন কবছর তো পূজো হচ্ছে 'নমো নমো'।

গ্রামবৃদ্ধদের বিচিত্র বিশ্বাস খঁকাখুঁকির ওপরে। তাঁদের বিশ্বাস, এদেবতার কৃপায় শিশুদের যাবতীয় রোগ সারে। পেঁচোয় পাওয়া, ভুতে পাওয়া, দাঁত লাগা, রাত-কান্না, রসতড়পা, রসপিতাড়ি, কানেরপুঁজ এমনি সব শিশুরোগ আছে। এ সবই সেরে যায় এ দেবতার স্মরণ নিলে। বৃদ্ধরা আরও বললেন, শিশু হঠাৎ কঁাদলে বা অনবরত কাঁদতে থাকলে, তাকে আনতে হবে থানে। ঠাকুরের চানজল কিংবা থানের মাটি দিতে হবে তার মাথায়। বন্ধ হবে তার কান্না। মনে পড়লো, এমনি এক ঠাকুর আছেন বাঁকুড়ার উপকণ্ঠে সানবাঁধা গ্রামে। তাঁর নাম কাঁদন্যাবুড়ি। লোকে বলেছে, শিশু কান্নায় তিনি সেরা উপশমকারিণী। তিনিও লোহারদের ঠাকুর। তিনিও আছেন মনসা ভৈরব প্রভৃতির সঙ্গে। সেখানেও শিশুকে নিয়ে যান মায়েরা তাদের বিবিধ রোগে, কান্নায়।[২] এখানে খঁকাখুঁকিকে লোকে মানত করেন হাতিঘোড়া খেলনা ষোল আনা প্রভৃতি। দুরারোগ্য শিশুরোগে লোকে করেন 'সরাভরণ' কৃচ্ছ্রসাধনা। তা করতে হয় আমাবস্যার রাতে। রোগীর মা বাবা বা অন্য কোনো আত্মীয় বা রোগী স্বয়ং তা করেন। তিনি পূজারীর নির্দেশ মতো দুটি সরা ধরেন উপরে নীচে, যাতে দুটোর মুখ থাকে একদিকে। পূজারী এবার পড়েন তেলবাণ মন্ত্র। বিশ্বাস রোগ ভাল হবার হলে উপরের সরাটি ঘুরতে থাকবে আপনা-আপনি। তা ঘুরবে মাত্র ৩ তিনবার। না-ঘুরলে বুঝতে হবে রোগ সারবে না। বা সারতে দেরি আছে। সরাভরণ নিয়ে নানা রকম গল্প আছে লোক-মুখে। অবিশ্বাসীকে ঠাকুর রূপ দেখাতেন ভয়ঙ্কর ইত্যাদি। ছেলেপুলে না-হলেও লোকে সরাভরণ করতেন। সেক্ষেত্রে সরা থাকবে নিঃসন্তান নারীর মাথায়। এ দেশে ষষ্টীও সন্তানদাত্রী, সন্তান রক্ষাকর্ত্রী দেবতা।[৩] মায়েরা বছর বছর নানা সময়ে পূজো দেন তাঁর। তিনি উন্নত সংস্কৃতির দেবী। খঁকাখুঁকি তথাকথিত নিম্নবর্ণের সংস্কৃতির দেবী। তবে চরিত্র গৌরবে তিনি ষষ্ঠী থেকেও অধিকমান্য এ গ্রামবাসীর কাছে।

---

১. শ্রীঅতুল ধীবর (৬০)

২. দ্র রাঢ়ের গ্রামদেবতা (১ম খণ্ড বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৯) পৃ. ৯৯-১০১

৩. দ্র 'ষষ্ঠী' প্রবন্ধ (আঞ্চলিক দেবতা ঃ লোকসংস্কৃতি গ্রন্থ)

প্রাচীনেরা বলেন, খঁকাখুঁকি একসময় দেবতা ছিলেন না। তিনি ছিলেন এক জোড়া শিশু। ঘাটশিলার রংকিনীর থান থেকে এগ্রামে এসেছিলেন এক সাধু। তাঁর সঙ্গে ছিল দুটি নাবালক বালক-বালিকা। দুজনেরই বয়স পাঁচ থেকে সাত। সাধু তাদের লালন করতেন নিজের ছেলের মতোই। বলতেন, তারা তাঁর কুড়িয়ে পাওয়া সন্তান। তখন হন্ন্যাবাদ ছিল ঘন গভীর জঙ্গল। এখানেই তিনি স্থাপন করেছিলেন কালীভবানীকে। দিনের বেলা ভিক্ষে করতেন শিশুদের নিয়ে। ভবানীর পুজো করতেন বেশ আড়ম্বরেই। ক্রমে ক্রমে লোকজনও আসতে থাকে তাঁর এই আশ্রমে। হঠাৎ এক অমাবস্যায় তিনি বলি দিয়ে বসেন পালিত শিশু দুটিকে। সঙ্গে সঙ্গে তার হাত দুটিও কাটা যায়। সাধু গোঁগাতে থাকেন। পর দিন ভক্ত পুজার্থীরা আসেন। সাধু তাঁর পাপের কথা বলেন। কিন্তু তিনি এও বলেন, এখানে প্রতিষ্ঠা করে গেলেন খঁকাখুঁকিকে। যাঁর পুজো দিলে পৃথিবীতে আর শিশুমৃত্যু ঘটবে না। রোগ দূর হবে শিশুদের। সাধু প্রাণত্যাগ করলেন। সেই থেকেই এখানে পুজো হচ্ছে খঁকাখুঁকির।

একসময় শিশু হত্যার বেশ চল্ ছিল এদেশে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে এরকম কাহিনী শোনা যায়। পশ্চিম সীমান্ত বাংলার শিশুবলির কারণ ছিল অনেকগুলি। নতুন পুকুর খোঁড়া, আকাটপুকুরের পাড় কাটার উদ্দেশ্যে প্রথম চোট দেওয়া, পুরোনো টাকা কুড়িয়ে পেলে তার প্রথম ব্যবহার, রাজযক্ষ্মা বা মহাকুষ্ঠ নিবারণে বলি দেওয়া হতো এমন সব শিশুকে যাদের অন্নপ্রাশন হয়নি। পূর্বোক্ত গল্পে যে ঘাটশিলার রঙ্কিনীর প্রসঙ্গ আছে, সেখানে তো নরবলি হতো কিছুদিন আগে পর্যন্ত। শুধু ঘাটশিলাতেই নয়, নরবলির চল্ এদেশে আরো বহু স্থানেই ছিল। বাঁকুড়ার ইদপুর থানার আটবাইচণ্ডী গ্রামে দেবী আটবাইচণ্ডী, ছাতনার বাসুলী, বর্ধমানের কল্যাণেশ্বরীতে দেবী কল্যাণেশ্বরী, ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা, মেদিনীপুর-মৌলা-গড়বেতা, নরসিংগড়-জামসেদপুর-কদমা প্রভৃতি স্থানের রঙ্কিণী, মুর্শিদাবাদের দোহালিয়ায় দক্ষিণাকালী প্রভৃতি অসংখ্য দেবীর স্থানেই নরবলি হতো তার প্রমাণও আছে যথেষ্ট। শুধু আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর নানা দেশেই নরবলি চলেছিল একসময়। পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে নাম করেছেন প্রাচীন মিশর চীন গ্রীসেরও।[১] কিন্তু যাদের বলি দেওয়া হয়েছে তাদেরি আবার দেবতা বানিয়েছে, এমন ইতিহাস মেলেনি। মেদিনীপুর গ্রামের প্রাচীন লোককথাতেই মিলছে তার একমাত্র নমুনা। গল্পটি অবশ্যই

১. বিস্তৃত আলোচনা: 'ধর্মের নামে নিগ্রহ তখনও ছিল, এখনও কিছু আছে' (মি. চৌ. কা.)—যুগান্তর ৫ ২৮.১.৭০

এদেবতাকে মানুষ পুজোর সংগে সংশিলষ্ট করছে। কিন্তু লোকগল্পের ইতিহাস এমনি যে, তাব পাথুরে প্রমাণ দেওয়া যাবেনা কিছুতেই।

তবে খাঁকাথুঁকির পুজোর মধ্যে মিশে আছে নানা ধর্মসাধনা। এর মধ্যে আছে বিচিত্র সব আদিম যাদুবিশ্বাস। তার সঙ্গে আছে প্রাচীন প্রজননবাদ। মনসা কালী প্রভৃতি লৌকিক ধর্মধারাও মিশে গেছে এঁর নানাকৃতো ॥

বরক'না

বর-বৌ নিয়ে বাড়ি ফিরছিল বরযাত্রিরা। ক্লান্ত হয়ে জল খেতে নেমেছিল তারা এক বড় বাঁধে। অমনি লাগল দৈবরোষ। জলে ডুবে গেল সব—বরকনে বরযাত্রি বাজনদার, এমন কি বাজনাটি পর্যন্ত। আর উঠল না।—গল্পটা হিড়বাঁধ অঞ্চলের। বাঁকুড়া জেলার খাতড়া থানার ২নং ব্লক হিড়বাঁধ। হিড়বাঁধের নিকটবর্তী গ্রাম বরক'না। এ গল্প এখানেরই। এখানেই ডুবে গিয়েছিল সেই হতভাগ্য বরকনেব দল, তাদের সর্বস্বকিছু নিয়েই। পরে সে-সব পাষাণ হয়েছে। গ্রামের একদিকে যে উঁচু টিলা, এখানে যাকে বলে ডুংরি, সেখানেই আছে বেশকিছু পাথর। বরবধূর মতো মানানসই ছোটোবড়ো বেশ চমৎকার যে দুটি পাথর, তা-ই হলো গল্পের বর কনে। তাদের পাশে এলোমেলো বা একত্রে কিছু অবস্থিত, ঐগুলি হলো বরযাত্রি। আর ঠিক ধামসার (বাদ্যযন্ত্রবিশেষ) মতো যে ৪।৫টি, ঐগুলি হলো বাজনা। প্রায় পাথরই ৩ থেকে ৪ ফুট উঁচু। মোট পাথর ৫০টি।—এগুলি দেখিয়েই গ্রামবাসী বলেন সেই বরক'না ডুবে যাওয়ার সুপ্রাচীন কাহিনী। দেবতাজ্ঞানে এগুলিকে পুরুষানুক্রমেই মান্য করছেন তাঁরা, পুজো দিচ্ছেন গ্রামদেবতা 'বরক'না' বলে। এ থেকেই তাঁদের গ্রামের নামও বরক'না।

বাঁকুড়া থেকে যাওয়া যায় বাসে। বাঁকুড়া-মসিয়াড়া (ভায়া খাতড়া) বাসে নামতে হবে বাউরিডিহায়। সেখান থেকে পশ্চিমে হাঁটতে হবে ৩ মাইল। বাঁকুড়া-ঝিলিমিলি বাসে গেলে নামতে হবে সুপুরে। সেখান থেকেও পশ্চিমে হাঁটাপথে ৪ মাইল। বাঁকুড়া মানবাজার বাসে গেলে নামা যায় হিড়বাঁধে। সেখান থেকে দক্ষিণে হাঁটাপথে ৩½ মাইল। সাঁওতাল পল্লী বরক'না গ্রাম। মাত্র ৩০।৪০ ঘর। সাঁওতাল ভিন্ন অন্য সম্প্রদায় নেই। গ্রাম সীমান্তে ডুংরিতে ঠাকুরের থান। থানে আছে কিছু পলাশ গাছ। অদূরেই ইউক্যালিপসটাসের জঙ্গল। পূর্বোক্ত পাথরখণ্ডগুলিই ঠাকুরের প্রতীক। কোথাও কোনো হাতিঘোড়া নেই। আগেও ছিল না। হাতিঘোড়া দেবার চলও নেই এখানে।

পুজো করেন সাঁওতালরাই।[১] তবে বরক'না গ্রাম ছাড়াও পুজো দিতে আসেন পাশাপাশি ৮।১০টি গ্রামের সাঁওতালরাও। এ গ্রামগুলির নাম পুকুরডি, বাউরি-ডি, জামডহরা, মিরগি, বাগমারি, তিলাবনী, হিড়বাঁধ, চাঁপাশোল প্রভৃতি। তবে এঁর পুজো হয় না প্রতিদিন। সারাবছরে এঁর পুজো ১ দিন, একবার, আষাঢ়ে, প্রথম রোয়ার আগে, অর্থাৎ চারা পোঁতার আগের কোনো ১ দিন। তবে তাঁকে মানসিক করা যায় যে কোনো মুহূর্তেই। কিন্তু মানসিক শোধ দেওয়া যায় ঐ একটিমাত্র দিনেই। তবে অত্যাবশ্যকীয় পুজো হয় বৃষ্টি না হলে। তখন গ্রাম-বাসী সমবেত ভাবে বসেন, পুজোর দিন স্থির করেন, পুজো হবে কিনা তারা সে বিষয়ে অনুমতি নেন ঠাকুরের। তবে পুজো হয় না কোনো ব্যক্তিবিশেষের দরকারে। পুজোর নৈবেদ্যও কিছু নেই। এক সময় লাগতো সিঁদুর তেল। তা গুলে ছিটিয়ে দেওয়া হতো সব প্রতীকেরই গায়ে। পরে দেওয়া হয়েছে মণ্ডামিঠাই চিনি ফলমূল ইত্যাদি। এখন বরকনে প্রতীক দুটির মাথায় ধান দূর্বাও দেওয়া হচ্ছে। তবে একান্তভাবেই লাগে পাঁঠা বলি। কিন্তু মানুষের বিশ্বাস বরক'না ঠাকুর যখন মানুষ ছিলেন, তাই তাঁর নৈবেদ্য হবে মানুষের খাদ্যের মতোই। এজন্যেই পুজারী দিয়েছেন মদ, মাংস (অবশ্য বলির কাঁচামাংস), খেজাড়ি (পান্তাভাত)। কিন্তু বহুদিন আগেই এসব বন্ধ হয়েছে সভ্যসমাজের সঙ্গে তাল রেখে। কমতে কমতে এখন শুধু চিনি দিলেও খুশি হন না পুজারী বা অন্য কেউ।

পুজার্থীদের ধারণা, বরক'না সুবৃষ্টি ও সুফলনের দেবতা। লোকে বলে, বৃষ্টি হওয়ার লক্ষণটি ধরা যায় কনে ঠাকুরটির মাথায় সিঁদুর দেখে। বৃষ্টি হবার হলে, তাঁর মাথায় সিঁদুরটি হয়ে উঠবে অতি গাঢ় ও জ্বলজ্বলে। এবং বৃষ্টি না-হবার হলে, তাঁর মাথায় যতই সিঁদুর লাগানো যাক, তা হয়ে উঠবে ফ্যাকাশে। অর্থাৎ বরক'না প্রজনন দেবতা। সে তথ্য সমর্থন করে তাঁর নাম-টিও। বরক'না মানেই নবদম্পতি, মানেই বিবাহ অর্থাৎ নতুন সৃষ্টি, সন্তান সৃষ্টি। বৃষ্টি মানেও নতুন শস্যাদির জন্মকে সম্ভাবিত করার শ্রেষ্ঠ এক উপাদান। —সুতরাং সন্তান ও শস্য এ কামনার সঙ্গে যুক্ত এই দেবতা যথার্থই প্রজনন দেবতা। কিন্তু প্রাচীন গল্পটি তাকে পূর্বপুরুষ বা মানব পুজোর সঙ্গেও যুক্ত করে দেয়। সেকালের মদ, পান্তা ও মাংস নৈবেদ্যই তার প্রমাণ ছিল॥

১. লুদু সাঁওতাল (৫৫)

মালিনা

রাঢ়ের এক প্রাচীন স্থান গড়মান্দারণ। তার খ্যাতি ঐতিহাসিক সাক্ষ্যে। এখনকার হুগলী জেলায় এর অবস্থান গোঘাট থানায়। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মভূমি কামারপুকুর থেকে মাত্র ৫ কি.মি. দক্ষিণে। কামারপুকুর-ক্ষীরপাই-ঘাটালগামী বাসে যাওয়া যায়। খুব পুরোনো গ্রাম। একাদশ শতাব্দীর কবি সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁর 'রামপালচরিত কাব্যে' যে 'অপার মন্দারে'র উল্লেখ করেছেন, গবেষকের মতে তা-ই হলো বর্তমান গড়মান্দারণ। স্বচ্ছসলিলা দামোদর নদীর দক্ষিণ তীরে বিরাট এক ঢিপি, যাকে বলে ধ্বংসস্তূপ। তার মাথায় বিরাট এক সমাধি (৬ × ৩′)। সমাধির চারপাশেই ছোটো ছোটো মাটির ঘোড়া। তার ওপরে অহোরাত্র জ্বলছে মোমের প্রদীপ। এ সমাধি ইসমাইল গাজীর।[১] তিনি ছিলেন গৌড়েশ্বর হুসেন-শাহের সেনাপতি। এ সমাধিকেই বলে 'বড় আস্তানা'। এর একমাইল উত্তরপূবে আর একটি ধ্বংসস্তূপ। এখানে আছে 'ছোট আস্তানা'। এমনি অনেক ঐতিহাসিক কীর্তি ছড়িয়ে আছে সারা মান্দারণের সর্বত্র—'ভিতর গড়', 'বাহিরগড়', 'বাদশাহী ঈদগাহ', 'পাতালদীঘি', 'ফরমানদীঘি', লক্ষ্মীজলা', 'শকুনজলা', 'ফুলজলা', 'কালেখাঁর আস্তানা', 'ফতেখাঁর আস্তানা', 'সানবাঁদি', 'গণশাহীদা' ইত্যাদি।

এসব দেখতে যাচ্ছেন হাজার হাজার মানুষ। দূর, নিকট, নানাস্থান থেকেই আসছেন তাঁরা। অধুনা গড়মান্দারণ তৈরী হচ্ছে একটি শ্রেষ্ঠ পর্যটনক্ষেত্র রূপে। সরকারী উদ্যোগে সংস্কার হচ্ছে তার প্রাচীন পরিখা, গড়ে উঠেছে পুষ্পোদ্যান, সুরম্য ট্যুরিস্ট লজ। তৈরী হচ্ছে আমোদর বুকে ঝুলন্ত সেতু। তৈরী হবে মিউজিয়াম, কুমীর প্রকল্প, সাপ প্রকল্প, মৃগোদ্যান এমনি কত কি! নয়ন মন কেড়ে নেবে গড়মান্দারণ তার আধুনিক অঙ্গসজ্জায়। হিন্দু মুসলমান খ্রীশ্চান আগে আসতেন ধর্মের নামে, ইতিহাসের টানে। এবার আসবেন ভ্রমণে।

কিন্তু আমার আকর্ষণ অন্য। সে হলো তার পুরোনো কিছু লোককাহিনীতে, অবহেলিত কিছু ঐতিহাসিক সাক্ষ্যে কিংবা উপেক্ষিত কিছু লৌকিক তথ্যে। গ্রামের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে এক বিরাট ডাঙ্গা। লোকে বলেন, সে হলো, 'হাতি-শালের আড়া'। আড়ার পূবদিকে এখন প্রচুর ধান জমি। একসময় থানটা ছিল ঘন গভীর জঙ্গল। এখনো তার চিহ্ন আছে কোনো কোনো জমিতে। সেই ধ্বংস-

---

১. 'কুন্ডু খাঁ' প্রবন্ধে পীর ইসমাইল সম্পর্কেও আলোকপাত আছে (পৃ. ২৮)

প্রাপ্ত জঙ্গল বা এখনকার ধানখেতের মাঝে আছে পাকুড় গাছের নীচে একটা ঝোপ। ঝোপের নিচে কালোরংয়ের এক পাষাণ মূর্তি। দৈর্ঘে দেড় ফুট, প্রস্থে এক ফুট, উচ্চতায় আড়াই ফুট। দেখতে অনেকটা মানুষেরই মতো। লোকে একেই পুজো দিচ্ছেন 'মালিনীঠাকুর' বোলে। মালিনী শিলার পাশেই আরেক শিলা। লোকে বলেন, তিনি 'মালিনীর বোন'। মনসা আছেন মালিনীর সঙ্গে। আর আছে বেশকিছু পোড়ামাটির হাতিঘোড়া। লোকসংখ্যা গ্রামের প্রাচীনত্বের তুলনায় বেশি নয়। সব মিলিয়ে হবে হাজার তিনেক। দেবদেবী আছেন বেশ কিছু। শিব, শীতলা, ক্ষুদিরায় ধর্ম, 'কামিনী' নাম্নী ধর্মকামিন্যা এবং মালিনী। তাছাড়া নানাস্থানেই আছে বেশকিছু মুসলিম ধর্মপীঠ, পীরপীরাণীর আস্তানা, বিচিত্র সব ঐতিহাসিক কবর।

মালিনীর নিত্যপুজো। প্রতিদিন পুজো হয় একবারই, দুপুরের আগেই। নৈবেদ্য লাগে সুনির্দিষ্ট এক সের সেদ্ধ চাল। তবে পুজোর্থিনীরা চালের সঙ্গে দেন ফলমূল মিষ্টি কাঁচা আনাজ। আর সকলেই দেন কাঁচা গাই-দুধ। আগে লোকে দিতেন ছোটো ছোটো হাতিঘোড়া। এখন আর সে সব দেন না কেউ। পুজো করেন বেতবনী গ্রামের চক্রবর্তী ব্রাহ্মণেরা।[১] কাশ্যপ এঁদের গোত্র। মান্দারণের পাশেই বেতবনী। সেখানেও 'গড়স্তম্ভ' ছিল। তার ধ্বংসাবশেষ আছে এখনো। মালিনীর পুজো হয় কামিনীর ধ্যানে—'ওঁ বন্দে সুন্দরাকান্তিমু বিকটা হাদিসুখিম-' ইত্যাদি। পুজারীর ভাষায়, তাঁর প্রিয় ফুল জবা, প্রিয় নৈবেদ্য কাঁচা দুধ। পুজোর যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেন গ্রামেরই একাদশ তিলিরা।[২] তাঁদের পদবী মণ্ডল। তাঁদের বলে 'দেউলে' বা সেবাইত। দেউল যাঁরা রক্ষা করেন, দেউলে তাঁরাই। সেবাপুজো চালান যাঁরা সেবাইত বলে তাঁদেরই। দিনপুজো ছাড়া দেবীর বিশেষ পুজো হয় প্রতি সংক্রান্তিতেই। এদিন তাঁর হয় চিঁড়ে ভোগ। জ্যৈষ্ঠমাসে হয় বার্ষিকী। তা হয় শনি মঙ্গলবার ধরে। তবে দিনটা বা তারিখটা স্থির করেন গ্রামের লোকজন আলোচনা করে। বার্ষিকী পুজোয় ধুমধাম একটু বেশিই হয়। তবে কোনো পুজোতেই বলি হয় না। বলি সম্পূর্ণই নিষিদ্ধ।

মালিনী গ্রামদেবী। কিন্তু গ্রামবাসীর গভীর বিশ্বাস, তিনি একদা দেবী

১. পুজারী শ্রীক্ষুদিরাম চক্রবর্তী (৬০)
২. সেবাইত শ্রীসুবল মণ্ডল (৫৫)

ছিলেন না, তিনি ছিলেন মানবী। এ নিয়ে গল্প প্রচলিত আছে অঞ্চল জুড়ে। সে কাহিনী হলো এইরকম ঃ "মান্দারণে তখন হিন্দুরাজার রাজত্ব। গ্রামের এক মালিনী ফুল দিতেন রাজ অন্দরে। কিন্তু মালিনী হলে কি হয়, তাঁর রূপ ছিল, তাঁর গুণ ছিল। হঠাৎ মুসলমানরা আক্রমণ করলে মান্দারণ রাজ্য। প্রবল অত্যাচার চালালে হিন্দুদের ওপর। বাদ গেল না শিশু ও নারীরাও। এদের শিকার হলেন সুন্দরী যুবতী মালিনীও। তিনি লুকিয়ে রইলেন জঙ্গলে। মুসলমানের কুদৃষ্টি পড়লে সেখানেও। জনৈক মুসলমান ছুটে এসে জাপটে ধরলে তাঁকে। সঙ্গে সঙ্গে মালিনী পরিণত হলেন পাষাণে। ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল লোকটা। কিন্তু মালিনীর আর পরিবর্তন ঘটলো না। ঘটনাটা কানে গেল ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের। তাঁরা বন্ধ করলেন নারীহরণ ও শিশুহত্যা। অমনি দলে দলে গ্রামবাসীরা এসে প্রণাম জানালেন মালিনীর পাষাণ-মূর্তিকে। পুজো করলেন তাঁরা। মানবী মালিনী এমনি করে পরিনীত হলেন দেবীতে। চলু হলো তাঁর পুজোর। স্বপ্নাদেশ পেলেন গ্রামের একাদশ তিলিরা। তাঁরা ছিলেন হিন্দুরাজার অর্থসচিব। তাঁদের তত্ত্বাবধানে চললো মালিনী পুজো।"

প্রচলিত কাহিনীতে আরো শুনি, আমোদর নদীর জল যেদিন ডুবিয়ে দেবে মালিনীর পাষাণ মূর্তিকে, সেদিনই ঘটবে তার পাষাণদশার মুক্তি। ১৯৭৮ সালে এখানে হয়েছিল এক ভয়াবহ দেশপ্রাবী বন্যা। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, কিন্তু তখনো ডুবেনি মালিনী পাথরের মাথা। অথচ ডুবে গিয়েছিল সারা মান্দারণের বাড়ি ঘর। রামায়ণে আছে অহল্যার পাষাণ হওয়ার কাহিনী। তার প্রভাব পড়তেই পারে মালিনী কাহিনীতে। অবশ্য গড়মান্দারণেই শুনি মানুষের পাথর হওয়ার আর একটি কাহিনী ঃ মান্দারণের অধিপতি ইসমাইল গাজী। তিনি বীর, কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তির মানুষ। দেবতাদের দিয়েও তিনি দুর্গ তৈরি করান একরাত্রে। তিনি প্রধান সেনাপতি ছিলেন গৌড়েশ্বর হুসেন-শাহের। নতুন দুর্গের খবরে বিচলিত হলেন হুসেনশাহ। ডাকলেন গাজীকে। ঘোড়ায় চড়ে গাজী এলেন হুসেনের ফটকে। অমনি তাঁর মাথা কেটে দিলে হুসেনের লোকজন। সঙ্গে সঙ্গে কাটা মাথা ধড়ের কাছে ঘুরতে লাগলে। কাটা মাথা ও ধড় নিয়ে তীরবেগে ঘোড়া ফিরে এল মান্দারণে। কাটা মাথা চিৎকার করে বললে 'পান দাও পান দাও'। বেরিয়ে এলেন দুইরক্ষী কালে খাঁ, ফতে খাঁ। তাঁরা বুঝতে পারলেন না সে কথার অর্থ। অনেক চিৎকারের পর কাটা মাথা তাঁদের অভিশাপ দিলে 'তোরা পাথর হ'। পাথর হলেন কালে খাঁ, ফতে খাঁ।

মাথা পড়ে গেল মাটিতে। বলে গেল, পান দিলে মাথা জুড়ে যেত, বেঁচে যেতেন ইসমাইল গাজী।[১]

রাঢ়ের আরো কিছু স্থানে মালিনী নিয়ে নানা লোককথা আছে। সর্বত্রই তিনি ফুল দিয়েছেন রাজমহলে, রাণী বা রাজকন্যার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্টতা প্রচণ্ড। বাংলা-বিদ্যাসুন্দর কাব্যেও মালিনীর সাক্ষাৎ মেলে। সাঁওতালী উপকথাতেও সন্ধান পাই এক 'মালিনী বুড়ি'র। পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোককথার 'মেলানী-মাসি'ই মালিনী। 'মালঞ্চ' নামেও গ্রামদেবী আছেন রাঢ়ের অন্তত দুটি স্থানে। একটি বাঁকুড়া জেলার বড়জোড়া থানার নতুনগ্রামে, যাঁর আলোচনা আগেই করেছি 'রাঢ়ের গ্রামদেবতা' গ্রন্থে (পৃ. ১৭০)। আরেক 'মালঞ্চ' আছেন বীরভূমের খয়রাশোল থানার কদমডাঙ্গায়। খয়রাশোলেরই কেন্দ্রগড়িয়ায় বাউরি সমাজের উপাসিত এক দেবীর নাম 'বাগানবুড়ি'। কিন্তু এঁরা স্বতন্ত্র এক এক গ্রামদেবী। কেউই যুক্ত নন মানুষ পুজোর কিংবদন্তীর সঙ্গে। পাশ্চাত্যপণ্ডিতের তত্ত্বে, এঁরা সংশ্লিষ্ট উর্বরতা বা ফার্টিলিটি কাল্টের সঙ্গে যুক্ত। তাঁরা শস্য ফুল ফল উৎপাদক ও রক্ষণকারী দেবী। গড়মান্দারণের মালিনীর মধ্যেও সে উর্বরতাবাদ আছে। লোকের বিশ্বাস, তিনি ক্ষেত্রদেবী। তিনি পূর্ণ করেন চাষীদের মনস্কামনা। তাঁর পুজো দিলে উৎকৃষ্ট ফসল হয়। বন্যা রোধ হয়। তাঁর পুজো দিলে নষ্ট হয় না গাই-এর বাঁটের দুধ। এজন্যেই প্রথম বিয়োনো গাইয়ের দুধ সকলে দেন তাঁকে। এমনিতেও দুধ দেন পূজার্থিনীরা। নতুন আলোচাল, আলোধান দেন অনেকেই। অবশ্যই এ ভাবনা কালে কালে সংযুক্ত। দীর্ঘপ্রচলিত পাষাণ হওয়ার কাহিনীর সত্যতা নির্ণয়ও একালে অসম্ভব। তবে তাঁর পুজোয় আদিম অলৌকিক শক্তিসম্পন্না নারী পুজোর জড় থাকাটাই স্বাভাবিক। সে ভাবনা আদিম সমাজে প্রবল ছিল একসময়। পরে যখন বিস্তার ঘটলে কৃষির, তখন অনেক পূর্বপুরুষ দেবতাই পরিণত হলেন কৃষির দেবতায়॥

---

১. সুধীরকুমার মিত্র: হুগলী জেলার দেবদেউল (১৩৭৮) পৃ. ৯১০
ডঃ গোপেন্দ্র মুখোপাধ্যায়: ইতিহাসের আলোকে গড় মান্দারণ (১৩৯৬) পৃ. ৬০

ব্রাহ্মণচণ্ডী[১]

সারা রাঢ়েই ছড়িয়ে আছেন নানা নামের লৌকিক দেবী চন্ডীরা। ক্ষেত্র গবেষণায় তেমন নাম পেয়েছি শতাধিক।[২] উত্তরবঙ্গ বা দক্ষিণবঙ্গেও লৌকিক চন্ডীরা আছেন। কোথাও তাঁর নাম স্থানযোগে, কোথাও গ্রামভেদে, কোথাও বা মানুষের কোনো মূল্যবোধযোগে। ব্যক্তি বা জাতি নামেও তাঁর নাম আছে। প্রায় চন্ডীর সঙ্গেই আছে কিছু না কিছু লোককাহিনী। বড়ো বিচিত্র সে সব কাহিনী। বীরভুমের পতন্ডা গ্রামে এক গ্রামচন্ডী আছেন। তাঁর নাম ব্রাহ্মণচন্ডী। লোকে বলে, তিনি আদিতে ছিলেন সাধারণ এক গৃহবধূ, তিনি দেবতা ছিলেন না। কাহিনীটি মিলেছে নানামুখে নানরকম ঃ

"সারা দেশে চলছে বর্গীর হাঙ্গামা। এক ব্রাহ্মণবধূ শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিলেন পাল্কী চেপে। প্রচন্ড গ্রীষ্ম। ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন বাহকেরা। তৃষ্ণার্ত হয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু চারদিকে ঘন বন। মাঝে এক ফালি রাস্তা। দেখলেন অদূরে একটা ছোট্ট জলাশয়। আনন্দিত বাহকেরা পাল্কী নামালেন রাস্তায়। জল পান করতে গেলেন ˆলাশয়ে। অমনি রে বে চীৎকার। ছুটে এলো বর্গীদস্যুরা। তারা লুট করতে গেল পালকিটি। প্রাণভয়ে ছুটতে লাগলেন বধূ। বর্গীরা তেড়ে আসছে তাঁকে। হঠাৎ বধূটি একটা বিরাট তেঁতুল গাছের আড়ালে এলেন। প্রার্থনা করলেন তাঁকে রক্ষা করার জন্যে। দস্যুরাও তখন এসে গেছে। হঠাৎ-ই গাছের গুঁড়ি দুফাঁক হয়ে গেল। ঢুকে পড়লেন বধূটি। চোখের সামনেই গাছটা জুড়ে গেল। দস্যুরা বধূর আঁচলটুকু ধরতে

১ 'ব্রাহ্মণ-চন্ডী' নামটি শুনেছি গ্রামবাসী, পূজারী ও উপাসকদের মুখে। কিন্তু আচার্য ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (কুন্ডমিঠা, সিউড়ি) এক সাক্ষাৎকাবে (১. ৯. ১৯৭৫) বলেছিলেন, 'আসলে তাঁর নাম হবে ব্রাহ্মণীচন্ডী'। ডঃ অমলেন্দু মিত্র তাঁর 'রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর' গ্রন্থে তাঁব নাম উল্লেখকবেছেন 'ব্রাহ্মণীচন্ডী'। অপরদিকে পতন্ডার ধনঞ্জয়বাটি নিবাসী শিক্ষক এম. সুলতান শাহ এ'ব কিংবদন্তী লিখেছেন 'পতন্ডা-ব্রাহ্মণ-চন্ডীতলা' (১৯৭৩, প্রকাশক সাতকড়ি মুখোপাধ্যায, পতন্ডা) নামক পুস্তিকায়। এ পুস্তিকায় (১-২০ পৃ.) তিনি সর্বত্রই 'ব্রাহ্মণ-চন্ডী' নামটিই ব্যবহার করেছেন। তিনি এ পুস্তিকা লিখেছেন তৎকালীন দুই পূজাবী গুরুপদ সরকার ও ভবানীপদ সরকারেরই সাহায্যে। আমিও ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত কিছু কিছু লেখায় ও আমার 'রাঢ়ের গ্রামদেবতা' গ্রন্থে এ'কে ব্রাহ্মণীচন্ডী বলেছিলুম। যেহেতু এটি গ্রাম সংস্কৃতির ইতিহাস, তাই এবার গ্রামের মানুষের মুখেমুখে ফেরা নামটিই—'ব্রাহ্মণ-চন্ডী' ব্যবহার করছি।

২. আঞ্চলিক দেবতা ঃ লোকসংস্কৃতি (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯১) 'চন্ডী' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

পারল। কিন্তু তারা ভয় পেয়ে গেল প্রচণ্ড। দস্যু হলেও তারা ছিল দেবী দুর্গার ভক্ত। সন্ত্রস্ত দস্যুরা নতজানু হয়ে ক্ষমা চাইলো বৃক্ষদেবীর কাছে। তারা পুজো করলো একযোগে। ঘটনাটা ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। অমনি আরম্ভ হলো বৃক্ষদেবীর পুজো। লোকে দেবীকে চিহ্নিত করল 'ব্রাহ্মণচণ্ডী' বোলে। আজও সে পুজো চলেছে। গাছটাও বেঁচে আছে।"

কাহিনীটির একটু পৃথক রূপ পাই স্থানীয় লেখক এম. সুলতান শাহের 'পতণ্ডা ব্রাহ্মণ চণ্ডীতলা' পুস্তিকায়। তিনি লিখেছেন ঃ

"সম্ভবতঃ ঘটনাটা ঘটেছিল বাংলার রাজা শশাঙ্কের পর। কর্ণসুবর্ণে ছিলেন এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ দম্পতি। বহু ধর্মাচবণে জন্মেছিলেন তাঁদের কন্যা 'ইন্দুমতী'। বীরভুমের রাজনগরে তখন রাজত্ব করতেন 'বীররাজা'। ইন্দুর রূপে মোহিত হয়ে তিনি বিয়ে করেছিলেন তাঁকে। একদা ইন্দুকে স্বামীগৃহে পাঠালেন ব্রাহ্মণ দম্পতি। সঙ্গে দিলেন কয়েকজন পথ-রক্ষীও। পাল্কী চেপে ইন্দু আসছিলেন। প্রচণ্ড গ্রীষ্ম। বনের সরু পথ। তৃষ্ণার্ত বাহকেরা এসে পৌঁছুলেন পতণ্ডার কাছাকাছি স্থানে। জল খেতে গেলেন পাল্কী নামিয়ে একটা কাঁদরে (খালে)। হঠাৎ দস্যুরা উপস্থিত। তারা ইন্দুর গয়নাগাটি ছিনিয়ে নিলে। এবার তাঁর সতীত্ব নাশে উদ্যোগী হলো তারা। প্রাণপণে ছুটতে লাগলেন ইন্দু। বিরাট এক তেঁতুলগাছের তলায় এলেন তিনি। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানালেন তাঁকে রক্ষা করার জন্যে। গাছ ফাঁক হলো। তিনি ঢুকে পড়লেন। দস্যুরা এসে দেখলে বধূর আঁচলটুকু বেরিয়ে আছে গুঁড়ি ভেদ করে। দস্যুরা ভীত হয়ে ফিরে গেল।" সুলতান শাহের শেষ কথা—'এই সেই তেঁতুলগাছ, আর সেই ব্রাহ্মণকন্যা ইন্দুমতী, যিনি পরে ব্রাহ্মণচণ্ডী নামে অভিহিত হইয়া সবার সেবাপুজো গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন।'

বীরভূম জেলায় সিউড়ি থানায় পতণ্ডা গ্রাম। সিউড়ি শহর থেকে সাত কি. মি. পূর্বে। পুরন্দরপুর থেকে উত্তরে মাত্র তিন কি. মি.। বাসযোগে যাওয়া যায়। বোলপুর পর্যন্ত ট্রেন। বোলপুর সিউড়ি বাস। সিউড়ি থেকে পুরন্দরপুর বাস। সেখান থেকে হাঁটাপথ উত্তরে পতণ্ডা গ্রাম। বেশ বড়ো গ্রাম পতণ্ডা। এখন তার সাথে মিশে গেছে ধনঞ্জয়বাটি, উদনপুর, জুলনগঞ্জ, ভগবানবাটি। হাজার দেড়েক লোকের বাস। তন্মধ্যে বাগদি ও হাড়ি প্রায় ৬৬-ঘর। ব্রাহ্মণ মাত্র ৮ ঘর। বাকিরা হলেন বায়েন, কলু, শুঁড়ি, সদ্‌গোপ, ধীবর, সূত্রধর, তাঁতী। আদিবাসী বা সাঁওতালও আছে ১৫ ঘর। গ্রামের পূব দিকে এক বিরাট প্রাচীর ঘেরা স্থানে আছে ব্রাহ্মণ-চণ্ডীর থান। তিনি ছাড়া গ্রামে আছেন শিব, মহাকাল, ভৈরবনাথ, আষাঢ়ে-ধর্ম, মনসা, হাড়ি-পালোয়ান (ব্রহ্মদৈত্য), দুর্গা

কালী প্রভৃতি। ব্রাহ্মণচণ্ডীর সামনেই আছেন শিব। তাঁর মাথায় আছে কোদালে চটানোর দাগ। সে নিয়েও আছে লোককথা। পুরন্দরপুরের হালদারদের একটি গাই নাকি প্রতিদিন এক অনাবাদী জমিতে দুধ দিত। হালদার নাকি গাইয়ের অনুসরণে এসে দেখেছিলেন সে দৃশ্য। তিনিই মাটি খুঁড়ে বের করেন শিবলিঙ্গটি। মাটি খুঁড়তে গিয়েই চোট লেগেছিল লিঙ্গে। তিনিই সেই লিঙ্গটিকে স্থাপন করেছিলেন ব্রাহ্মণচণ্ডীর তলায়। চণ্ডীতলার পূর্বদিকের পুকুরটির নাম 'হালদার-পুকুর'। এ পুকুর নাকি বহন করছে তাঁরই পুণ্যস্মৃতি। চণ্ডীর পূর্বদিকে আছেন বৃদ্ধেশ্বর শিব, দক্ষিণে আছেন মহাকাল ভৈরবনাথ। বৃদ্ধেশ্বরের গাজন চৈত্র সংক্রান্তিতে (২৭-৩০শে চৈত্র)। হাঁটুপালোয়ান থাকেন এক নিমতলায়। ১ মাঘ তাঁর মেলা। বাত বেদনার উপশমকারী বলেও তিনি পুজো পান। ধর্মরাজের বার্ষিকী হয় আষাঢ়ে।

ব্রাহ্মণচণ্ডীর থান প্রায় আট কাটা জমি ঘিরে। সবটা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। চারদিকে তার চার গেট। প্রাচীরের মধ্যেই তিন শিব ও দুর্গার থান। এছাড়াও আছে একটি পরিত্যক্ত শিব মন্দির। ব্রাহ্মণচণ্ডীর কোনো মন্দির নেই। তিনি আছেন অতি প্রাচীন এক তেঁতুল তলায়। গাছটির গোড়ায় প্রায় পাঁচ ফুট উঁচু বেদী। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠা যায়। পুজোস্থল সামান্যই সিমেণ্ট বাঁধানো। দেবী আছেন তেঁতুলগাছের গোড়ায় এক প্রাচীন কোটরে। তাঁর প্রতীক কষ্টিপাথরের একটি ছোট্ট শিলা। লম্বায় ৪½ ইঞ্চি, চওড়ায় ৩ ইঞ্চি। কিন্তু শিলায় কিছু আঁকা আছে কিনা, তা স্পষ্ট বোঝা যায় না। ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও ডঃ অমলেন্দু মিত্র এ-মূর্তিকে বলেছেন মহিষমর্দিনী দুর্গার। কোনো কোনো গ্রামবৃদ্ধ বা পূজারীরাও বলেছেন সে কথাই। বিশেষজ্ঞ বলবেন, এ মূর্তি পালযুগের সৃষ্টি। বেদীতে আছে আট ন-টি নক্সা আঁকা পাথর। এ গুলি প্রাচীন কোনো মন্দিরের গায়ের পাথরও হতে পারে। কোনো কোনো গ্রামবৃদ্ধ বলেন, একসময় দেবীর পাথরের মন্দির নির্মিত হচ্ছিল। কিন্তু তা চাননি তিনি। তাই ধ্বসে পড়ে সে মন্দির। সুতরাং গাছের গোড়ায় মন্দির চাপা পড়ে থাকাটাও বিচিত্র নয়।

পুজো করেন 'সরকার' পদবীর ব্রাহ্মণেরা। এখন এঁরা চার ঘর। তাই পালা করে পুজো। এঁদের মতে, অন্ততঃ পাঁচপুরুষ ধরে পুজো করছেন তাঁরা। আদি পূজকের নাম গীতিনাথ সরকার। গীতিনাথের পুত্র রামগোবিন্দ। রামগোবিন্দের পুত্র নকুড়চন্দ্র। নকুড়চন্দ্রের চার পুত্র অভয়পদ, শম্ভুপদ, গুরুপদ ও ভবানীপদ। সম্প্রতি পুজো করছেন এই চার জনের পুত্রেরা। তাঁদের সঙ্গে পালা পেয়েছেন অপুত্রক ভবানীপদর দৌহিত্ররা। এঁরাই আবার পুজো করেন শিব ও ভৈরব-

নাথের। এদের গোত্র কাশ্যপ। 'সরকার' এঁদের পাওয়া উপাধি। একদা মোগলযুগে এ খেতাব দেওয়া হয়েছিল। তখন রাজস্ব আদায়কারীকে কিংবা আয়ব্যয় হিসাব রক্ষককেই সরকার বলা হোতো। হয়তো এঁরা তেমনি কোনো রাজকার্যে লিপ্ত ছিলেন এক সময়। কিন্তু এঁদের আগে অন্য কোনো জাতি এ দেবীর পুজো করতেন কি না তা বলতে পারেন না কেউ। দেবীর পুজো হয় পঞ্চোপচারে। তা হলো পাদ্যঅর্ঘ্য, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য। নৈবেদ্য হোলো আলোচাল মিষ্টি ফলমূল প্রভৃতি। পুজো হয় 'কালাব্রাভাং'…ইত্যাদি মন্ত্রে।[১]

দেবীর নিত্যপুজো। বিশেষ পুজো দুর্গাপুজোর সময় বিজয়ার রাত্রে, দুর্গার প্রতিমা বা ঘটবিসর্জনের পর। পুজোর পর বলিদান। বার্ষিকী পুজো হয় সাধারণত বৈশাখ মাসে। দিন স্থির করেন পুজারী ও উপাসকেরা বসে আলোচনা কোরে। তবে পুজো হয় মঙ্গলবার ধোরে। এদিন সরকার বংশের একজন পুজারী থাকেন। তাঁর সঙ্গে যোগদেন বহিরাগত একজন ব্রাহ্মণ। এ ব্রাহ্মণও স্থির হয় সমবেত আলোচনায়। পুজো দেন পতন্ডা গ্রামের সকলে, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে। বার্ষিকীতে পুজো দিতে আসেন পাশাপাশি নানা গ্রামের মানুষ; ভগবানবাটি, ভোলনগঞ্জ, ভ্রমরকোল, বিদায়পুর, খড়িকটিকুরি, ইকড়া, বাঁশড়া প্রভৃতি গ্রামের ভক্তজন।

ভক্তদের গভীর বিশ্বাস, সর্ববিধ কল্যাণ দেন ব্রাহ্মণচণ্ডী। লোকে সব রকম মনস্কামনাই জ্ঞাপন করেন তাঁর থানে। তাঁদের ধারণা কলেরা বসন্ত মহামারী দূর করেন তিনি। সে নিয়ে প্রবাদ সৃষ্টি হয়েছে অতীতকালে। নারীদের বিশ্বাস তিনি বন্ধ্যাদের সন্তান দান করেন। চাষীরা পুজো দেন শস্য ও বৃষ্টির জন্যে। লোকে বলেন তিনি অনাবৃষ্টি দূর করেন। দেশকে করেন শস্যশ্যামলা। পুজারী দেবীর নামে কোনো ওষুধপত্র বা তাগা কবচ দেন নি কখনো।

কেউ কেউ বলেছেন এ দেশের আরো কিছু স্থানে ব্রাহ্মণচন্ডী নামক দেবী আছেন। দক্ষিণভারতের এক দেবীর নাম 'কামাচ্ছি-মা'। তাঁর সন্ধান দিয়েছেন পন্ডিত রেভারেন্ড হেনরি হোয়াইটহেড। প্রবাদপ্রবচনে তাঁর সঙ্গে মিল আছে ব্রাহ্মণচণ্ডীর। ব্রাহ্মণচন্ডীর কিংবদন্তীগুলির বিচার করেছেন কেউ কেউ। ডঃ অমলেন্দু মিত্র লিখেছেন: "এই সকল কিংবদন্তীর সত্যাসত্য নিরূপণের কোন

---

১. ৺অভয়পদ সরকার > অনিল + শরৎ (৬৫) + পবিত্র (৫৫)। পবিত্র > স্বপন (৩৫)। ৺শম্ভুপদ > শিশির (৬৩)। ৺গুরুপদ > ৺বসন্ত + কৃষ্ণকুমার (৫০) + রবীন্দ্রনাথ + পূর্ণচন্দ্র। ৺ভবানীপদ > দৌহিত্রগণ। এই সমীক্ষা ৬.১.১৯৯১ তারিখে। সাহায্যে— বর্তমান সিউড়ি নিবাসী শ্রীতপনকুমার প্রধান (বাড়ি—কেঁদুয়া থানার খাড়ুন্দী গ্রামে)।

উপায় নেই, তবে এইটুকু অনুমান করা যায় যে অব্রাহ্মণ্য সমাজের নিকট ব্রাহ্মণ্য মহিমা প্রতিষ্টার উদ্দেশ্যেই সত্যমিথ্যা মিলিয়ে এই ধরনের উপকথার সৃষ্টি হয়েছিল।" কিন্তু আমরা সহজে সে উপকথাকে পারছি না উড়িয়ে দিতে। গল্পে আছে স্বামীর গৃহে যাচ্ছিলেন নবপরিনীত বধূটি। মানেই নতুন জীবন সৃষ্টির ব্যাপার অর্থাৎ সন্তান লাভের কামনা। এ দেবতা সন্তানদাত্রী। পাশ্চাত্ত্য পন্ডিত তত্ত্বে ইনি সংযুক্ত ফার্টিলিটি বা উর্বরতাতন্ত্রের সঙ্গে। লোকবিশ্বাসেও তাই শোনা যাচ্ছে। আরো শোনাযাচ্ছে ইনি বৃষ্টিদাত্রী। এ ভাবনাও আদিম উর্বরতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তবে কিছু যাদুবিশ্বাসও মিশেছে কালে কালে। সে হলো মড়ক মহামারী বসন্ত নিবারণ শক্তি। এখানে পড়েছে শীতলার প্রভাব।

সন্তান কিংবা শস্যদান অথবা বৃষ্টিদান সবদেশেরই একটি আদিম মানব বিশ্বাস। ব্রাহ্মণচন্ডীর মধ্যে এই প্রত্নবিশ্বাসটি বলবৎ। তবে আদিবাসী ও তথাকথিত অন্ত্যজ সমাজে ব্রাহ্মণ্য মহিমা প্রতিষ্ঠাও এ-দেবতার পূজোর মূলে থাকতে পারে। ব্রাহ্মণ আধিপত্যের যুগে এমনি সব গ্রামদেবতার উদ্ভব ঘটেছিল। কিন্তু এসব স্বীকার করেও আর একটি সত্য মেনে নিতে হয়, তা হল, ব্রাহ্মণ-চন্ডীর পূজোর মূলে আছে একধারে আদিম বৃক্ষ পূজো ও পূর্বজ মানুষ পূজোর অভিব্যক্তি। এদেশে এমনি বৃক্ষ পূজোর অভাব নেই। শুধু চন্ডী নামেও এদেশে বৃক্ষপূজো আছে অনেক স্থানে। যেমন, চব্বিশপরগণার কাঁচড়াপাড়া, নৈহাটি, হালিশহর এবং বীরভুমের কামারহাটিতে যে ঢেলাইচন্ডী পূজিত হন, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তার মধ্যে বৃক্ষ পূজো লক্ষ্য করেছিলেন। সে হলো একটি খেজুর গাছ। বাঁকুড়া জেলায় কোতুলপুর থানার পুনিয়াজোল গ্রামের পুনেচন্ডী আসলে একটি শেওড়া গাছ। তেমনি দক্ষিণ বঙ্গের নানাস্থানে পূজিত কুলাইচন্ডী হলেন এক একটি কুলগাছ ছাড়া কিছুই নয়। পশ্চিম সীমান্ত বাংলার বেতচন্ডীর মূলে আছে বেতগাছ পূজোর অভিনব প্রয়াস।

রাঢ়ের এমনি অনেক গ্রামদেবতা আছেন, যাঁদের পূজোর মূলে আছে প্রত্ন বা আদিম মানুষের পূর্বপুরুষ পূজোর লক্ষণ। ব্রাহ্মণ-চন্ডীর ক্ষেত্রে এই কিংবদন্তীটি আছে। শুধু এখানেই নয়, দক্ষিণ ভারতের 'কামাচ্ছি-মা' পূজোর মূলেও আছে এমনি এক ব্রাহ্মণ-বালিকার উপাসনার জড়্। হোয়াইটহেড তাঁর 'ভিলেজ গডস্ অফ্ সাউথ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে সেকথা জানিয়েছেন স্পষ্ট করে—**She is reported to have been born a Brahmin girl and then to have become the avatar of one of the Asta Sakit.**[১] সুতরাং অন্য উপায় না পেলেও এ দেবতার মধ্যে আদিম নারী পূজোর সূত্র মেলে॥

১. **Village Gods of South India (1921) p. 31.**

গোঁসাই, সন্ন্যাসী ও পীর

বৃহত্তর রাঢ়ের অনেক স্থানেই সাড়ম্বরে পুজো পান 'গোঁসাই' নামে এক গ্রামদেবতা। তাঁর সবচেয়ে বেশি থান আছে বীরভূম জেলাতে। সেখানে অবশ্য তাঁর সঙ্গে মিশে গেছেন ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মদত্তি। সারা বীরভূমে এঁদের কম করেও একশো থান আছে। বর্ধমান জেলাতেও গোঁসাই আছেন। তেমন একটি প্রসিদ্ধ থান পূর্বস্থলী থানার সাতপোঁতা। আর এক প্রসিদ্ধ গোঁসাই আছেন সাঁওতাল-পরগণার কুণ্ডহিত থানার শুদ্রাক্ষিপুরে। বীরভূম জেলার বিখ্যাত কিছু থান হলো ঃ সিউড়ি থানার কামালপুর, কুলেড়া, পুরন্দরপুর, মল্লিকপুর, রণপুর, রাইপুর, সেকমপুর, হাসনাবাদ। খয়রাশোল থানার কৃষ্ণপুর, পালসাই, মামুদ-পুর, হজরৎপুর, রাঙামেটে। রাজনগর থানায় তাঁতিপাড়া, নাকাশ, পাতাডাং। মহম্মদ বাজার থানার খয়রাকুঁড়ি, ভুতুড়া। লাভপুর থানার দাঁড়কা প্রভৃতি।

প্রতীক সর্বত্রই ত্রিশূল। কোথাও ত্রিশূলের পাশেই একজোড়া খড়ম। কোথাও তাও নেই, সেখানে তাঁর সিদ্ধপীঠ বেলগাছই পূজিত হয় যথানিয়মে। সাধারণত ১ বা ২ মাঘ তাঁর পুজোর দাগা দিন। শনি বা মঙ্গলবার ধরেও পুজো হয় কোথাও কোথাও। কোথাও তাঁর বার্ষিকী বুদ্ধপূর্ণিমার দিন। ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ, সকলেই তাঁর পূজার্থী। সবজাতির লোকই তাঁর পুজো দেন শুদ্ধাচারে। সর্বত্রই তাঁর নৈবেদ্য 'মালসাভোগ' বা ক্ষীরপায়েস। নিম্ন সমাজে দেওয়া হয় পচাই মদও। মেলাও বসে কোনো কোনো স্থানের গোঁসাইর বার্ষিকীতে। নানা লোকবিশ্বাসও শোনা যায় নানাস্থানের গোঁসাইকে নিয়েই। সর্বত্রই তাঁকে বলা হয়েছে 'জাগ্রত দেবতা'। কোথাও তাঁর পুজো শস্য উৎপাদনে বা শস্য রক্ষায়, কোথাও তাঁর পুজো রোগ সারানোর আশায়, কোথাও তাঁর মানসিক বন্ধ্যাদের সন্তান কামনায়। ধন অর্থ সন্তানলাভ মনস্কামনাসিদ্ধি—এ সব তো শোনা যায় প্রায় সর্বত্রই।

কিন্তু গোঁসাইঠাকুরকে লোকে তেমনি দেবতা বলেই মনে করেন, যিনি মানুষ ছিলেন এককালে। অনেকে[১] বলেন, 'একসময় তিনি ছিলেন অলৌকিক শক্তিধর পুরুষ। মানুষের উপকার করে বেড়ানোই তাঁর কাজ ছিল। রোগে তিনি ওষুধ দিতেন, কবচ দিতেন। গুরু বোলে মানতেন গ্রামবাসী। বাড়িতে এলে তাঁর সমাদর চলতো ঠিক দেবতার মতোই। কালক্রমে তাঁর শিষ্যপ্রশিষ্যের এক একটি চমৎকার গোষ্ঠীও গড়ে উঠতো। মৃত্যুর পর তিনি পুজো পেতেন

১. সাক্ষাৎকারে কথিত— (ক) কবি কুমুদরঞ্জন, জয়দেব কেন্দুলী (২৮.৪.১৯৮২), (খ) ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কুড়মিঠা (১০. ১০. ১৯৭৬), এমনি নানাগ্রামের সুধী ব্যক্তিগণ।

প্রধানত গোষ্ঠীর দ্বারাই। আরো পরে তিনি পুজো পেয়েছেন সাধারণ মানুষের। ক্রমে তিনি পরিণত হয়েছেন গোষ্ঠী দেবতায়। তা থেকে গ্রামদেবতায়।'

গোঁসাই পুজোয় প্রাচীন ধর্মগুরু পুজো অর্থাৎ পূর্বজ মানুষ পুজোর অবশেষ থাকাটা অসম্ভব নয়। বীরভুমের ব্রহ্মচারী ব্রহ্মদত্তি কিম্বা সন্ন্যাসী পুজোর মধ্যে পূর্বজ ধর্মগুরু বা মানুষ পুজোর নানা চিহ্ন খুঁজে পেয়েছেন ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল ও ডঃ অমলেন্দু মিত্র। ডঃ মণ্ডল পাড়ুকের পাশের গ্রাম রামনগরের এক সন্ন্যাসী ঠাকুরের প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

> "ঝোপে ঝাড়েভরা একটি উঁচু ডাঙ্গায় দেবতা সন্ন্যাসীঠাকুরের আস্তানা। আমরা পূর্বে এঁকে ধর্মঠাকুরের বা সত্যপীরের রূপান্তর বলে মনে করেছিলুম। এখন মনে হচ্ছে, ইনি বৌদ্ধভিক্ষুর ছায়ারূপ হতে পারেন। এবং সে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীঠাকুর অব্যশই অবস্থান করতেন বিধ্বস্ত স্থানীয় বৌদ্ধবিহারে। মুণ্ডিত মস্তক, দণ্ডকমণ্ডলুধারী, কাষায়বস্ত্রপরিহিত যে বৌদ্ধসন্ন্যাসী একদা এই বৌদ্ধবিহারে ধ্যানাসীন থাকতেন, বুদ্ধবীজ উচ্চারণ কবতে করতে জনপদে বিচরণ করতেন, আবার সুযোগ বুঝে, গৃহস্থের বয়স্থা কন্যা কুমারীকে অপহরণ করে ভিক্ষুণী করবার জন্যে সচেষ্ট হতেন—সে কালের সেই ভক্তিশ্রদ্ধা ও আতঙ্কের প্রতিমূর্তিসমূহই ভোলবদল করে, একালে দেবতারূপে আঞ্চলিক প্রান্তের বনেজঙ্গলে, ডাঙায় ডহরে, অশরীরী মূর্তিতে জনগণের পুজো আদায় করছেন—তাতে সন্দেহের কিছু নাই।"[১]

বীরভুমের লাভপুর থানার পূর্বমহুলা গ্রামেও আছেন এক গোঁসাই সন্ন্যাসী। আহমদপুর-কাটোয়া ছোট রেলপথে লাভপুর। সেখান থেকে এ-গ্রামে যাওয়া যায়। এখানে এক পুকুরের পাড়ে বেলগাছের তলায় তিনি পুজো পান ১ মাঘ। তাঁর নামে মেলাও চলে দশ-পনের দিন। ইনিও যে একসময় অলৌকিক শক্তিধর মানুষ ছিলেন, সে নিয়ে প্রবাদ আছে নানারকম। লোকের ধারণা, বোলপুর শহরের উত্তর-পূর্বে প্রায় ৬ কি. মি. দূরে অবস্থিত শিয়ান গ্রামে যে 'ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির' নামে মেলা হয়, তাও প্রাচীন এক ঋষি পুজো। এখানে তাঁর মানব রূপের প্রবাদ। মাঘ মাসে তিনদিন ধোরে তাঁর নামে মেলা হয়। এই ঋষি অঙ্গরাজ লোমপাদের মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। তাঁর বাবার নাম ছিল বিভাণ্ডক। রামায়ণে ঋষ্যশৃঙ্গের কথা আছে। সাঁইথিয়া থানার ভালিয়ানের বৈরাগ্যচাঁদ ঠাকুরও মানুষ ছিলেন বলেই প্রবাদ।

অর্থাৎ সবস্থানে না হোক, অনেক স্থানের গোঁসাই, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী বা ব্রহ্মদত্তি ঠাকুর যে একসময় মানুষ ছিলেন, একথা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায়

১ রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর (১৯৭২), ভূমিকা

না। যদিও কালে কালে তাঁর পুজোআজায় নানা সংস্কার বিশ্বাস মিশে গেছে। এসেছে নানা যাদুবিশ্বাস, ভয়-ভীতিজনিত নানা কল্পনাপ্রবণতা। এঁদের সম্পর্কে তাই গ্রাম বৃদ্ধদের ধারণাটিই যথার্থ—(১) এঁরা ধর্মকর্মে রত ছিলেন। (২) এঁরা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতেন। (৩) গ্রামের যে কোনো কল্যাণকর কাজে লিপ্ত থাকতেন। (৪) লোকের বিপদেআপদে জীবনপণ সাহায্য করতেন। (৫) রোগে অসুখে কোবরেজি করতেন, তাগা তাবিজ দিতেন, ওষুধপত্র দিতেন, ঝাড়ফুঁক করতেন, কেউ কেউ তুকতাকও জানতেন। (৬) এঁরা গ্রামপ্রান্তে কখনো থাকতেন কুঁড়েবেঁধে, কখনো অন্তর্হিত হতেন বহুদিন ধোরে। অথবা সময় সময় আসতেন কিংবা যেতেন। (৭) এঁদের দু'চারজন চেলাও থাকতো, গ্রামের কিছু-লোকও চেলা বনে যেতেন এঁরা এলে। তবে শ্রদ্ধা পেতেন সারা গ্রাম জুড়ে। সবশ্রেণীর মানুষই, এমন কি চোর ডাকাতও এঁদের সমীহ করতো। (৮) সম্বল বলতে একটি পুঁটলি, একজোড়া খড়ম, একটি চিমটে আর কিছু জড়িবড়ি। (৯) এঁদের মৃত্যু ঘটলে, সারা গ্রামের মানুষ কুটিরে ভেঙে পড়তেন। দলে দলে লোক আসতেন ভিন্ন গ্রামগুলি থেকে। স্মৃতিবেদীও নির্মাণ করতেন ধনী ব্যক্তিরা। নামগানের ব্যবস্থা করতেন চেলারা। এমনি করেই সন্ন্যাসীঠাকুর পুজো পেতেন মৃত্যুর পর। চেলা বা ভক্ত সমাজ 'জোরালো' থাকলে তাঁর আশ্রম বা আস্তানা সমানে চলতো। নিত্যদিন তিনি পুজো পেতেই থাকতেন। চেলারাই তখন ওষুধপত্র দিতেন। এমনি করে তাঁর ওপর দেবত্বের বিশ্বাস আরোপিত হতো।

এদেশের প্রায় সব ধর্মমতেই অনুরূপ ধর্মগুরু বা সাধক পুজোর চল আছে। বৈষ্ণবেরা তাঁদের সমাজের বিখ্যাত ধর্মগুরুদের পুজো করেন। শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীনিবাস, শ্যামানন্দ, নরোত্তম, হরিদাস প্রমুখের নিত্য পুজো এখনো চলছে ঐসব নামাঙ্কিত আখড়ায় আখড়ায়। এসবই তো জীয়ন্ত মানুষ পুজোর অকাট্য নিদর্শন। তেমনি একালে পূজিত হচ্ছেন রামকৃষ্ণ সারদা বিবেকানন্দ তৈলঙ্গস্বামী প্রমুখ। ঠিক দেবতার মতোই। তেমনি নাথযোগীরাও পুজো পাচ্ছেন নানাস্থানে। মীননাথ (মৎস্যেন্দ্রনাথ), নেপালে তাঁর মন্দির আছে, রথযাত্রা উৎসব হয় তাঁর নামে। গোরক্ষনাথের থান আছে ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই। নাথযোগী গাভুরসিদ্ধা (চৌরঙ্গীনাথ), বিরুপাসিদ্ধা (বিরুপাক্ষনাথ), জ্ঞানেশ্বরনাথ, নামদেব প্রমুখ পূজিত হচ্ছেন বহু নাথ-মঠে। বর্তমান কালে জীবিত শ্রেষ্ঠ নাথযোগী বলে পূজিত শ্রীগম্ভীরনাথ দেহ রেখেছেন ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে। অলৌকিক শক্তিধর মহাযোগী বলে এখনো পূজিত হচ্ছেন গোরক্ষাবতার মস্তনাথ। যোগীরাজ সুন্দরনাথ দেহত্যাগ করেছেন ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে। এঁদের প্রত্যেকের সম্বন্ধেই গল্প আছে নানাবিধ। প্রতিটিতেই

প্রকাশ হয়েছে তাঁদের অতিমানাবিক অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের যোগবিভূতি ও মানব-কল্যাণের। বইও বেরিয়েছে এঁদের জীবনকথা নিয়ে।

মুসলিম দুনিয়ায় হজরৎ মহম্মদ পূজিত হচ্ছেন সাক্ষাৎ ঈশ্বর বা আল্লা রূপেই। এছাড়া এ-ধর্মের একশ্রেণীর অলৌকিক শক্তিধর সাধক পীর-দরবেশ বলেই পুজো পাচ্ছেন দেশে দেশে। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবাংলার সর্বত্রই আছে নানা পীরের বহু আস্তানা। তন্মধ্যে বিখ্যাত পীর হলেন হাড়োয়ার পীর গোরা-চাঁদ, ঘুটিয়ারী শরীফের পীর বড়-খাঁ-গাজী, ফুরফুরা শরীফের দাদাপীর, পাণ্ডুয়ার পীর শাহ্‌সুফী, বসিরহাটের হাসনাবাদের হাসান পীর, বর্ধমানের পীর খোকোরবাবা ও পীরবহরম, বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের কুরবান সাহেব, বীরসিংহপুরের নিরগিহশাহ, মেদিনীপুরের পটাশপুর অমর্ষি-কসবার মখদুম্‌পীর, ২৪ পরগণার শাঁকসহরের বাবনপীর, মরিচরে পীর ইসমাইল শা প্রভৃতি। এঁরা সকলেই ঐতি-হাসিক পীর। এঁদের সম্বন্ধে যেমন নানা অলৌকিক কাহিনী আছে, তেমনি ইতিহাসনিষ্ঠ জীবনীও মিলেছে। শুধু মুসলিমদেরই নয়, হিন্দুদের মনেও ভয়-ভক্তির ভাব জেগেছিল পীরদের নামে। এঁদের সম্বন্ধেও শহুরে ও গ্রামীন মানুষের ধারণাটি[১] হিন্দুর গোঁসাই বা সন্ন্যাসীদেরই মতো : (১) এঁরা সাধারণ ফকিরের বেশে নানাস্থানে ঘুরে বেড়াতেন। (২) যেখানেই কোনো মানুষের বিপদআপদ রোগশোকের সংবাদ পেতেই, সেখানেই ছুটে যেতেন তাঁকে সাহায্যের জন্যে। (৩) হিন্দু মুসলিম বলে কোনো জাতিভেদ বা উঁচু নীচু সম্প্রদায়ভেদ এঁরা মানতেন না। সব মানুষকেই ভালবাসতেন ও সেবা করতেন প্রাণ ঢেলে। (৪) রোগের চিকিৎসা করতেন সকলেই। (৫) ভিক্ষা করতেন সব জাতির বাড়িতেই। (৬) এঁদেরও ভক্ত বা শিষ্যের দল থাকতো। (৭) মৃত্যুর পর ভক্তরা সমাধির ওপর দরগাহ্‌ তৈরী করে দিতেন (৮) এবং দরগাহে প্রত্যহ ধূপ দীপ জেলে, তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করতেন। (৯) অনেকেই তাঁকে শিরণি (সিন্নী) মানসিক করতো। অর্থাৎ ফকির-ই মৃত্যুর পর পীরে পরিণত হয়ে পুজো লাভ করতেন। এককথায় পীর উপাসনা আসলে পূর্বপুরুষ পুজোর যথার্থ নিদর্শন।

তবে সব পীরই ঐতিহাসিক পীর নন। কিছু কিছু কাল্পনিক পীরও

সাক্ষাৎকার : সৈয়দ ফরিদুল হক (পূজারী খোক্করবাবাপীর, বর্ধমান ১৫.৫.১৯৯১) কবি গনিখান (পীরবহরম, বর্ধমান, ৫.৪.১৯৮৮) ডঃ আবদুস সামাদ (রাণীগঞ্জ কলেজ) ৭ ৪ ১৯৮৮ এনায়েৎ হোসেন খন্দেকার (কোতুলপুর, বাঁকুড়া) ১১.৩.১৯৭৭ ডাঃ মাকসুদ আলি (বর্ধমান ৪.৮.১৯৮৯), মহঃ হাফিজুর রহমান (কাওসার পত্রিকা, হুরিয়া, বর্ধমান ১.১.১৯৭৮)।

আছেন। যেমন মানিকপীর, সত্যপীর, পাগলপীর, বিবি বরকত প্রভৃতি। তেমনি হিন্দুদের সাধারণ অনেক গোঁসাই-ই ঐতিহাসিক ব্যক্তি নন। এমন কি লোকপ্রবাদ ছাড়া কোনো গোঁসাইকেই মানুষ হিসেবে গ্রহণের পাথুরে প্রমাণ নেই। পীরদের মধ্যে, কে সত্যিই মানুষ ছিলেন, কে ছিলেন না, তা জানা যায়। কিন্তু তেমন কোনো সুযোগ নেই গোঁসাই বা সন্ন্যাসীদের ইতিহাস জানার। তবে প্রবাদের ঐতিহ্য, জনমানসে প্রভাব, পুজো বা উপাসনা পদ্ধতি বিচার করে কোনো কোনো গোঁসাইকে পূর্বজ মানুষ পুজোর নিদর্শন বলে গণ্য করা যায়॥

ভিরকুনাথ[১]

বর্গীর হাঙ্গামা চলছে দেশজুড়ে।[২] লুটপাট, গ্রামজ্বালানো, নারীধর্ষণ, খুন, রাহাজানি। আতঙ্কিত জনগণ প্রাণভয়ে পালাচ্ছে সাতপুরুষের ভিটে ছেড়ে। বাঁকুড়ার শালতোড়া থানার রাউতোড়া (রাওতোড়া) গ্রাম। সেখানের প্রাচীন জমিদার রাউতেরা। ধনরত্নে তাদের পূর্ণ ভাণ্ডার। বর্গীরা আসছে এগিয়ে। রাউতেরা পালতে চায়। যাবার আগে ওরা ধনসম্পদ বাসনকোসন সব রাখতে চায় মাটির ভেতর কুয়ো কেটে। নিজেদের এক জীবন্ত বংশধরকে সে-সম্পদ রক্ষার জন্যে করলে যক্ষ। তার নাম ভিরকু। ভাবলে, কখনো যদি বংশের কেউ ফিরে আসে, সেই ফিরে পাবে যক্ষ ভিরকুর কাছে গচ্ছিত রাখা এই ধনসম্পদ। কিন্তু এপর্যন্ত এবংশের কেউ ফিরে আসেনি বলে সংবাদ।

স্থানটি এখনো আছে। সেটা কুয়োর আকারে বৃত্তাকারে পাথর দিয়ে ঘেরা। মাঝে আছে একটি পাথর খণ্ড। তা-ই পুজো পায় ভিরকুনাথ নামে। এখন বাউরিদের দেবতা তিনি। বাউরিরা তাঁর পুজারী। এখন তিনি গরুর দেবতা। হারানো গরু ফিরে পাবার জন্যে তাঁর কাছে দেশবাসীর মানসিক। বিরিখিচুড়ি দিয়ে সে মানসিক শোধের ব্যবস্থা।

প্রাচীনেরা এ দেবতা সম্পর্কে গল্প বলেন আরো নানারকম। প্রচণ্ড বর্ষার হঠাৎ রোদ উঠলে লোকে দেখতো ভিরকু তার থানে কুলোয় করে মোহর শুকুচ্ছেন। কাছে গেলেই সব যেত মিলিয়ে। অমাবস্যার গভীর রাত্রে কে যেন থানে গুনছে টাকা। নাড়াচাড়া করছে বাসনকোসন। লোকে বলে, একসময়

১. দ্র. রাঢ়ের গ্রামদেবতা ১ম খণ্ড (ব. বি ১৯৮১) পৃ ৩৪-৩৬
২. ঐতিহাসিকদের মতে বর্গীহাঙ্গামার ঊর্ধতম সীমা ১৭৪২ খ্রীঃ নিম্নতম সীমা ১৭৫২ খ্রীঃ।
৩. এদের বংশধর বলে দাবীকরেন হিমালয় প্রদেশের রাউতেরা।

ভিরকুনাথের কাছে লোকে কাজঘরের (বিবাহ শ্রাদ্ধ প্রভৃতির) জন্যে বাসন চাইতো। প্রয়োজন মতো বাসন পেতো।

লোকশ্রুতি অনুসারে ভিরকুনাথ মানুষ বা শিশুপুজোর নামান্তর। তবে ভিরকুনাথ কোনো বিখ্যাত সন্ন্যাসী বা সাধক হওয়াও সম্ভব, যিনি অলৌকিক ক্রিয়াকর্মে জনসাধারণের পূজ্য হয়ে উঠেছিলেন। জৈন ও নাথ সন্ন্যাসীদের নামের শেষে নাথ শব্দের যোগ থাকে—ঋষভনাথ, শক্তিনাথ, শান্তিনাথ, পার্শ্বনাথ, সম্ভবনাথ, বা গোরক্ষনাথ, মীননাথ, গম্ভীরনাথ, চৌরঙ্গীনাথ, জালন্ধরনাথ প্রভৃতি। হয়তো এমনি এক সন্ন্যাসী ভিরকুনাথ। ভক্তরা তাঁকে নানাকারণে বেশকিছু ধনরত্ন দিয়েছিল, যার কিছু অংশ তিনি মাটিতে প্রোথিত করে মারা যান। সে ঘটনাই 'যক্ষ' কাহিনীতে রূপ নিয়েছে। পরবর্তী কালে তাঁর গুণ-মুগ্ধভক্তরা তাঁকে স্মরণার্থে তাঁর পূজার্চনা করে। তবে তিনি যে শ্রেষ্ঠ পশু-চিকিৎসক ও গণক বিদ্যা-বিশারদ ছিলেন, লোকবিশ্বাস অনুসারে তাও অনুমান করা সহজ। কালে-কালে নানা কালচার তাঁর পূজার্চনায় এসেছে। কিন্তু তিনি যে মানুষ ছিলেন, মানুষ থেকেই দেবত্বে উন্নীত হয়েছিলেন, তাও অস্পষ্ট নয়॥

[নাথযোগীদের অনেকেই পুজো পান এদেশের নানাস্থানে। ২৪-পরগণার রাজারহাট থানার অর্জুনপুর গ্রামে সাড়ম্বরে পূজিত হন গোরক্ষনাথ। মাঘী-পূর্ণিমায় তাঁর বার্ষিকী পুজো ও বিশাল মেলা। নাথ সম্প্রদায়ের কাছে তিনিও গ্রামদেবতার মর্যাদায় সমাসীন।]

ভাদু

কাশীপুরের রাজার বিটি বাগদি ঘরে কি কর।
হাতের জালি কাঁখে লয়ে সুখসাগরে মাছ ধর।॥

পঞ্চকোটের রাজা নীলমণি সিং। তাঁর আদুরে মেয়ে ভাদু। ভালো নাম 'ভদ্রাবতী, 'ভদ্রেশ্বরী'। কিন্তু রাজকন্যা হলে কি হয়, তাঁর টান গরীব-দুঃখী প্রজাদের ওপর ; বাগদি, সরাক, বাউরি, খেড়ে ও ভূমিজদের ওপর। ওদের দুঃখ সে দেখতে পারে না। ওদের ঘরে ঘরে যায়। বাবা বোঝান, মা বোঝান, সান্ত্রী-মন্ত্রীরা বোঝান : ওরা নিচু জাত। ওদের সঙ্গে মিশতে নেই। ওদের প্রতি ভাদুর মমতা ততই যায় বেড়ে। ওদের ওপর অন্যায় ব্যবহারের সে প্রতিবাদ করে। ঘা লাগে রাজার আভিজাত্যে। প্রচণ্ড বাধা দেয় রাজশক্তি। ব্যর্থকাম ভাদু করে আত্মহত্যা। ছুটে আসে রাজ্যের বাউরি-বাগদির দল। ওরা কাঁদতে

কাঁদতে ভাদুর মৃতদেহ নিয়ে যায় কাঁধে করে নদীঘাটে। দাহের পর গ্রামে গ্রামে ওরা বসে যায় শোক করতে। ওরা ভাদুর মূর্তি গড়ে। পুজো করতে থাকে দল বেঁধে ঃ 'প্রাণে ধৈর্য ধরে। প্রাণের ভাদু বিদায় দিই কেমন করে।'

ভাদুপুজো চলছে সারা মানভূমে, পুরুলিয়ায়। আর তার পাশাপাশি জেলাগুলিতে বাঁকুড়ায়, বীরভূমে, দক্ষিণ পশ্চিম মেদিনীপুরে। ভাদুপুজো দেখছি বর্ধমানে, হুগলীর কোনো কোনো স্থানে। তবে বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার মতো যেখানে অতো ব্যাপক নয়, পরবের মতো পরব করেও নয়। সাধারণত বাউরি বাগদি সরাক মুচি মাহাত ডোম খেড়ে হাড়ি এমনি সব তথাকথিত নিম্ন সম্প্রদায় এর উপাসক। প্রধানত কুমারী মেয়েরাই সেই উপাসনা করে। পুরুষেরা করে খুব কম ক্ষেত্রে। সে শুধু জাগরণ বা ভাসানোর দিনে। 'ভাদ্রমাসে ভাদু পুজা। দিয়ে মণ্ডা মিঠাই গজা।' ১ ভাদ্র তার আরম্ভ। ভাদ্রসংক্রান্তিতে বিসর্জন। ভাদুর প্রতিমা এক দেড় হাতের সুন্দর এক কন্যামূর্তি। প্রতি সন্ধ্যায় চিঁড়ে মুড়কি চিনি বাতাসা দিয়ে তার শীতল। পুরুত পুরোহিত লাগে না। কুমারীদের গানে গানে তার পুজো। তেমন গান অগণিত। প্রধানত সমাজ নিয়ে সংসার নিয়ে সে গান। নারী মনের, কুমারী মনের বিচিত্র বাসনায় সেগুলি টলোমলো ঃ

১. কি কি গয়না লিবি ভাদু বল্না গো আমারে।
পায়ে লিব নেপুর তড়া সাজব গো বাহারে ॥

২ বাপের ঘরে লাড়িচাড়ি নিজেই রাখি নিজেই খাই।
শ্বশুরঘরে লাড়িচাড়ি খাবার কথা বলতে নাই।
মুড়ি ভাজলাম কলাই ভাজলাম জনার ভাজা জিব লড়ে।
বুড়াবুড়ি গুঁড়াই খালয় জঁদা ফেনে পরান মরে।।

কিন্তু ভাদু সম্পর্কে পণ্ডিতি বিচার বিবিধ। বিচিত্রও। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য একে বলেছেন 'বর্ষাউৎসব', 'শস্য উৎসব'। বলেছেন, 'প্রকৃতপক্ষে ইহা আদিবাসীর করম উৎসবেরই একটি হিন্দুসংস্করণ মাত্র।'[১] ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত একে বলেছেন, 'উর্বরতা কেন্দ্রিক ধর্মসাধনা'। 'করম জাওয়া ধর্মবিশ্বাসের ফলশ্রুতি'। যদিও তাঁকে আকর্ষণ করেছে 'গানগুলির ভেতরের হৃদয়াতি''।[২] কিন্তু এসব ধারণার উদ্ভব আরো অনেকপরবর্তী কালে, একালে। একালের লোকশ্রুতিবিদ ডঃ সুধীরকুমার করণ একে বলেছেন 'ব্যক্তিপুজা বা সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট নজির মাত্র।'

১. বাংলার লোকসাহিত্য (৭৯, ১ম সং) পৃ. ১৮১
২. পুজাপার্বণের উৎসকথা (১ম সং) পৃ ১৫৪-৫৫

ভাদুর উৎসসন্ধানে আমরা অন্তত ২৫টি ভাদুপরবের স্থান পরিক্রমা করেছি। বাঁকুড়ার লক্ষ্মীসাগর, খাতড়া, সুপুর, বাঁকুড়া, পাহাড়শুশুনিয়া ও ফুলকুসমা; পুরুলিয়ার কাশীপুর, পাড়া, হুড়া, রঘুনাথপুর, মানবাজার, গোপালপুর, জিতুজুড়ি ও নেতুরিয়া; মেদিনীপুর জেলার শিলদা, বিনপুর, বেলপাহাড়ি, চিঁচড়া ও ঝাড়গ্রাম প্রভৃতি স্থানে বারবার গিয়েছি। ভাদুমূর্তির বৈচিত্র্য দেখেছি। ভাদু সম্পর্কে আরো অন্তত ৫টি কিংবদন্তী শুনেছি:

২. ভাদু কাশীপুরের রাজকন্যা। কিন্তু এক বাউরি তরুণের সে প্রেমাসক্ত। মিলনের পথে আসে রাজার দেওয়া প্রচণ্ড বাধা। শেষ পর্যন্ত রাজকন্যা বাধ্য হয় আত্মহত্যা করতে। তারপর তার পুজোয় বসে বাউরিদের মেয়েরা।

৩. কাশীপুরের রাজার মেয়ে ভাদু। কিন্তু তার মেলামেশা নিচু জাতির মুনিস কামিনদের সঙ্গে। ওদের জন্যই ওর যত ভাবনা। জনৈক মুনিসের এক সুশ্রী ছেলেকে সে ভালোবাসে। বিয়ে করতে চায়। রাজা তা শুনে ভাদুর বিয়ের ব্যবস্থা করেন। পাত্র আসে বনপথে। অকস্মাৎ ডাকাত পড়ে পাত্রের পালকীতে। বরকে নিহত করে তারা। সে দৃশ্য দেখে রাজা অবাক হন। রাজার লোকই খুন করে ভাদুকে। রাজ্যের নিচুজাতিরা বসলে তাকে পুজো করতে।

৪. রাজকন্যা ভাদু। তার বিয়ে। বর আসছে বনপথে। হঠাৎ ডাকাত পড়লো। ডাকাতেরা বরকে হত্যা করে ছিনিয়ে নিলে সব। খবর পেয়ে রাজা প্রজা ছুটে এল ঘটনাস্থলে। ভাদু গেল সহমরণে। ভাদুর পুজোয় বসলে নারীরা।

৫. রাজকন্যা ভাদু। মীরাবাঈর মতোই সে জন্ম কৃষ্ণানুরাগিনী। গভীর-রাতে সে একাকী যায় মন্দিরে। রাজা একদা লক্ষ্য রাখলেন একান্তে। ভাদুর পেছনে পেছনে গেলেন। দেখলেন, ভাদু মন্দিরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলো। টিম-টিম প্রদীপ জ্বলছে। রাজা শুনলেন ভাদু কোনো পুরুষের সঙ্গে কথা বলছে। ক্রোধে অস্থির হয়ে দরজা ভাঙলেন রাজা। দেখলেন ছোট্ট মন্দিরে ভাদু আর বিগ্রহ ছাড়া কেউ নেই। ভাদু পড়লে আছাড় খেয়ে। মারা গেল ভাদু। রাজা প্রজা সকলেই বসলে ভাদুর পুজোয়।

৬. পঞ্চকোটের রাজা গেলেন শিকারে। কুড়িয়ে পেলেন ফুটফুটে এক কন্যাকে। তাঁকে আনলেন অন্তঃপুরে। এদিকে কৈলাসে দুর্গা নেই। খোঁজ খোঁজ রব। নারদ মর্তে এলেন। চিনতে পারলেন ফুটফুটে সেই মেয়েটিই দুর্গা। দুর্গা আত্মবিস্মৃতা। নারদ গানে গানে তাঁকে জানালেন শিব ও পুত্রদের কথা। অমনি মেয়েটি রাজাকে আত্মপরিচয় দিয়ে কৈলাসে ফিরলেন। সেদিন ভাদ্র-সংক্রান্তি। রাজা বসলেন তাঁর পুজোয়। সেই হলো ভাদুপুজো।

কালে কালে সৃষ্ট এসব লোক গল্প। প্রতিটিতে ভাদুর মানবীরূপের প্রকাশ। তবে দুর্গার গল্পটি ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের চমৎকার ফসল, মীরাবাঈর গল্পটি বৈষ্ণবভাবুকের আবিষ্কার। বাকি ১-৪ নং সাধারণ মানুষের নির্মান। এগুলি থেকে দুটি জিনিস পাই—(ক) ভাদুর সঙ্গে নিচুজাতির সম্পর্কস্থাপন ও রাজার আভিজাত্যে আঘাত, (খ) নিচুজাতির তরুণের সঙ্গে তার প্রণয়সক্তি। দুই ক্ষেত্রেই সে মৃত্যুর শিকার এবং এই মৃত্যুই তাকে জনসাধারণের কাছে দেবীতে পরিণতি দিয়েছে।

তবে নীলমণিসিংয়ের কথাও খুব প্রাচীন নয়। উনিশ শতকের মধ্য ভাগে তিনি জীবিত ছিলেন। প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিয়েছিলেন সিপাহীযুদ্ধে (১৮৫৭)। সে হিসাবে ভাদুকথা একান্তই অর্বাচীন। আর একথাও স্বীকার্য যে, টুসু-পুজোর মতো ভাদুপুজো এ অঞ্চলে আলোড়ন সৃষ্টি করতেও পারেনি। তা সর্ব-ব্যাপকও নয়। তা না-হলেও কাশীপুরের রাজপরিবারের রাজকন্যা যে ভাদু, সে কাহিনীর খুব প্রচার। ভাদুকে নিজেদের মেয়ে বলে দাবী করেন তাঁরা। এছাড়া ভাদুপুজোর বেল্টে অন্তত পঁচাত্তর ভাগ উপাসকই ভাদুকে কাশীপুরের রাজকন্যা বলে অভিমত দেন।

আমাদের ধারণা, ভাদু স্মৃতিপুজো মাত্র। পরবটিও ব্যক্তিকেন্দ্রিক। এ ধারণার মূলে আছে কয়েকটি তথ্য। (১) সমগ্র অঞ্চলেই ভাদুকে কাশীপুর রাজকন্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। (২) প্রচলিত ভাদুগানগুলিতেও সে তথ্যেরই সমর্থন মেলে। (৩) একমাত্র কাশীপুর তথা বৃহত্তর মানভুম অঞ্চলেই এই লোকউৎসবটি প্রচলিত। অবশ্য ক্রমে ক্রমে রাজপরিবারের প্রচেষ্টায় উৎসবটি ব্যাপকতা লাভ করেছে। তবুও টুসু, জাওয়া, করম, বাঁধনা, রোহিন, মনসা, শিকার, গমা কিংবা জিতা পরবের মতো ভাদু উৎসব সর্বব্যাপক হয়ে ওঠেনি। সমগ্র রাজ্যের মানুষকে স্পর্শ করতে পারেনি। তেমন করে পারেনি সাড়া জাগাতে। অর্থাৎ, লোকউৎসব হিসেবে ভাদু পুজোর আবেদন সার্বজনীন নয়। (৪) অপরপক্ষে ভাদু পুজো পণ্ডিত কথিত 'বর্ষা উৎসব' বা 'শস্য উৎসব'ও নয়। 'বৃক্ষপুজো'তো নয়ই। শস্য উৎসব হলে তা এতদিনে টুসু প্রভৃতি উৎসবের মতোই ব্যাপকতা লাভ করতো। এবং কিংবদন্তীগুলি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তো। বরং কুমারী-কন্যার পুজো থেকেই পণ্ডিতেরা তার মধ্যে 'শস্য উৎসব' বা 'বর্ষা উৎসব' বা 'মদন উৎসব' কিংবা ফার্টিলিটি কালটের আবিষ্কার করতে সুযোগ পেয়েছেন। মনে রাখতে হবে, এদেশের লোক-উৎসব তার নিজস্ব রীতিতেই প্রচলিত হয়েছিল। কুমারী কন্যা, কুমারীর মাতৃত্ব তৃষ্ণা, বিবাহ বিষয়ক কিংবদন্তী, অবৈধ প্রণয় ইত্যাদি তথ্যগুলি পাশ্চাত্যের

আলোকে এখন উজ্জীবিত হয়েছে। সেই হিসেবে ভাদু পুজো কুমারী কন্যার স্মৃতিপুজোর উল্লেখ্য নিদর্শন।

ভাদু যে মানুষ থেকে দেবীতে উন্নীত হয়েছিলেন তার মূল কারণ অকাল-মৃত্যু। কিংবদন্তী অনুসারে রাজকন্যার পক্ষে তথাকথিত মুনিস বা নিচু-জাতির সঙ্গে মেলামেশা এবং তাদের ছেলের সঙ্গে প্রণয়াসক্ত হওয়া কিংবা নিচু-জাতির প্রতি গভীর মমত্ববোধ এবং সেজন্যে তার মৃত্যু, এই ঘটনাই সমকালীন মানুষকে আকুল করেছিল। যথার্থ কারণে ভাদু জনসাধারণের মমতা ও মমতা-জনিত পুজো লাভ করেছিল। সে পুজো ক্রমে ক্রমে একটি বৃহৎ অঞ্চলে প্রসার লাভ করেছে। কন্যাস্মৃতিকে জাগরুক রাখার জন্যে রাজপরিবারেরও অবদান কম ছিল না। সুতরাং রক্তমাংসের এক নারী, মানুষের ভালোবাসার কাছে দেবীত্বে পর্যবসিত হয়েছিল। তাই হলো ভাদু পুজো ॥

অনুচিন্তা

ক. সতীমা

পূর্বপুরুষপুজোর অসংখ্য নিদর্শন আছে নদীয়া জেলার আনাচে কানাচে। পাটে পাটে শ্রীচৈতন্য, অদ্বৈত, শ্রীবাস, নিত্যানন্দ, জাহ্নবা, বিষ্ণুপ্রিয়া, শচীমাতা, বীরভদ্র, নরহরি, (সরকার) প্রমুখের নিত্যপুজো অর্চনাদি তার প্রমাণ। বস্তুত সারা রাঢ়েই নয়, সারা ভারতের সর্বত্রই বৈষ্ণব গুরুদের শ্রীপাট আছে। সেখানে ত্রিসন্ধ্যা তাঁদের ঘিরে পুজোআজা হয়, নাম সংকীর্তন চলে।

বৈষ্ণবদের নানা দল, মত ও আশ্রম আছে। একদল 'চৈতন্যপন্থী'। অন্যদল 'আউলপন্থী'। ভক্তরা বলছেন, চৈতন্য তাঁর জীবনে মুসলিম ও হরিজনদের সেবায় আত্মনিয়োগের সময় পাননি। তাই তাঁর আরেক জন্ম ঘটে 'আউল' নামে। তখন তিনি জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায়-বর্ণ-ভেদ সম্পূর্ণ তুলে দেন। এবার তিনি জন্মান নদীয়ারই উলাবীরনগরে। থাকতেন ঘোষপাড়ায়। নাম 'আউলচাঁদ। এই আউলচাঁদেরই শিষ্য-সম্প্রদায়ের নাম 'কর্তাভজা'। 'কর্তা' মানে 'গুরু'।

কিন্তু ঘোষপাড়ার মহিমা আউলচাঁদের নামে নয়, আউল-শিষ্য রামশরণ পালের নামেও নয়, রামশরণের পত্নী সতীমার নামে। লোকে বলে, তাঁর আসল নাম সরস্বতী। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে আউলচাঁদের দেহাবসান। সতীমা বেঁচে ছিলেন তারও পরে আধশতাব্দী জুড়ে।

কলকাতা থেকে কল্যাণী। কল্যাণী থেকে বাসে বা রিক্সায় ঘোষপাড়া। ঘোষপাড়ায় সতীমার থান। রামশরণের ভিটে। মন্দিরের কিছু দূরে হিমসাগর।

ভিটের ওপর ডালিমতলা, সেখানেই সতীমার সিদ্ধিলাভ। নিত্যপুজো। ত্রিসন্ধ্যা আরাধনা। দোলপূর্ণিমায় বার্ষিকী মহোৎসব। সারারাজ্যের লক্ষলক্ষ যাত্রির ভিড়। হিন্দুমুসলিম খ্রীষ্টান কোনো জাতভেদ নেই। চিঁড়ে মুড়কি বাতাসা কদমা চিনির মঠ দিয়ে সতীমার পুজো। বাদ যায় না চাষীদের ক্ষেতের শাকসব্জীও। কেউ কেউ দেয় লালপেড়ে শাড়ি, লালগামছা।

গভীর বিশ্বাস মানুষের। মনস্কামনা পুরণেব জন্যে লোকে ডালিমগাছে ঢিল বাঁধে, মাটির ঘোড়া বাঁধে। হিমসাগরে স্নান করে। লোকে বলে, এঁর পুজোয় পঙ্গু পর্বত ডিঙ্গোয়, অন্ধ চোখ পায়, বোবা কথা বলে, বন্ধ্যা সন্তান পায়, দুরারোগ্য রোগী সারে। আর যা যা মনের বাসনা সব মেলে। ভক্তরা দণ্ডী কাটে, হত্যা দেয়। দর্শন করে সতীমার সমাধি, তাঁর ও রামশরণের ব্যবহৃত বিছানা ও আসবাবপত্র। বার্ষিকীতে ভক্তরা দোল খেলে, আবিরে আতরে গোলাপজলে মাতামাতি করে।

দেশ দেশ থেকে আসে কর্তাভজা সমাজের ভক্তরা। বাউল দরবেশ সাঁই ফকিব পীর ভাট ভিখিরি সাধু সন্ন্যাসী আর যাত্রিতে ঘটে মহাসম্মিলন। জাতীয় সংহতির এতবড় নজির এদেশে অল্প। নাচে গানে বাজনায় মাইকে চিৎকারে চেঁচামেচিতে ঘোষপাড়ার চেহারা যায় পাল্টে। অথচ দুশো বছর পার হয়ে গেল, সতীমার মহিমা কমলো না, এই বিজ্ঞানের গগনজয়ী সাধনার যুগেও। এক এক সময়ে এদেশে নানা নারীর পুজো প্রচলিত হয়েছে। বিষ্ণুপ্রিয়া, শচীমাতা, জাহ্নবী, সীতা, হেমলতা, কিংবা মীরাবাঈ এদেশে নানা পাটে পুজো পান। একালের সারদামণি, কুসুমকুমারী (হরনাথ-পত্নী) পুজো পাচ্ছেন। কিন্তু সতীমার মতো এমন আশ্চর্য পুজোরীতি অন্যত্র দেখেনি। যে রীতিতে সব-ধর্ম সমন্বয়ের চেহারা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বা জাতীয় সংহতির রূপরেখা। রক্তমাংসের মানুষের পুজোর এ এক পাথুরে নিদর্শন ॥

খ. মা-ডুমনী

বৃহত্তর রাঢ় ছাড়াও এদেশের আরও নানা স্থানে ব্যক্তি-পুজো দেব-পুজোয় রূপান্তরীত হয়েছে। তার একটি উল্লেখ্য উদাহরণ মা-ডুমনীর পুজো। মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা থানা। তারছোট্টগ্রাম নওপুকুরিয়া, চলতি কথায় নপুকুর। বেলডাঙ্গা রেলষ্টেশন থেকে মাত্র ৩ কিঃ মিঃ দূরে। কাঁচা পথও আছে। নপুকুরের গ্রামদেবী মা-ডুমনী। শনি মঙ্গলবার ধরে তাঁর পুজো। বৈশাখ মাসে কোনো শনি বা মঙ্গলবারে তাঁর বার্ষিকী উৎসব। চতুর্ভুজা প্রস্তর মূর্তি। কেউ কেউ সেটিকে বৌদ্ধ তারা মূর্তি বলেছেন। দক্ষিণাকালীর ধ্যানে তাঁর পুজো। শোনা যায়, একটি পুকুর কাটতে গিয়ে এই মূর্তিটি আবিষ্কৃত

হয়েছিল। সম্প্রতি একটি ছোট মন্দির তৈরী হয়েছে। কিন্তু মূর্তিটিকে স্বপ্নাদেশ জনিত কারণে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। এখনোও সেটি আছে একটি বটগাছের নীচে বাঁধানো বেদীতে। সাধারণত সন্তান কামনায় কিংবা মৃতবৎসা দোষ খণ্ডনের জন্যে মা-ডুমুনীর পুজো। এখানেও মানসিককারীরা বটগাছের ডালে ছোট ছোট ইঁটের টুকরো বেঁধে দেন। পাঁঠা বলি হয়। পাটুনী পদবীর মাহিষ্য সম্প্রদায় দেবীর সেবায়েত।

প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে মা-ডুমুনী আদিতে ছিলেন নিতান্ত সাধারণ নারী। কিন্তু তিনি ছিলেন পরমা সুন্দরী কন্যা। একদা এক জমিদার এই কন্যার রূপে মুগ্ধ হয়। তাঁকে সে গান্ধর্ব মতে বিয়ে করে। সস্ত্রীক বাড়ী ফেরার পথে হয় প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি। ঝড় বৃষ্টি থামলে জমিদারের দলবল ক্ষুধার্ত হয়ে ওঠে। তারা রান্না চড়ায়। কিন্তু জ্বালানী পায় না। নববধূ তাদের কিছু বাঁশ কেটে আনতে বলেন। নিজের ছুরি দিয়ে সে বাঁশের চমৎকার ফালি কাটেন। যা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আগুন জ্বালানো যায়। লোকের সন্দেহ জাগে নববধূ ডোম কন্যা কিনা। এই সন্দেহ জমিদারের মনে প্রবল হয়। সে তাঁকে ঐ রাত্রে বনে ত্যাগ করে চলে যায়। মেয়েটি জ্ঞান হারান এবং পাষাণ মূর্তিতে পরিণত হয়। সেই মূর্তিই মা-ডুমুনী নামে এখন পূজিত হচ্ছে।

এ অঞ্চলে ডুমুনীদহ নামে একটি দহ আছে। লোকে বলে পরিত্যক্ত নববধূর চোখের জল থেকেই সেটি সৃষ্ট।

এই কিংবদন্তী অনেকেই একটি সত্যের ধারক বলে মনে করেন। জমিদার যে মেয়েটির ওপরে বলাৎকার করেছিল কিংবা তাকে লোভ দেখিয়ে বিয়ে করেছিল এবং যেকোনো কারণেই হোক তাকে ত্যাগ করে পালিয়েছিল, এ ঘটনা স্বাভাবিক। ধর্ষিতা নারীর আত্মহনন, অথবা বলপ্রয়োগ বিষয়ক কলঙ্কিত কাহিনী লুপ্ত করতে জমিদারের নারী হত্যা, এ ঘটনার মূলে আছে। ধনশালী ব্যক্তির পৈশাচিক ক্ষুধায় এমনি অনেক নারী বলি হয়েছে যুগে যুগে। তথাকথিত উচ্চবর্ণের দ্বারা নিম্নবর্ণের নারী ধর্ষিত ও পরিত্যক্ত হয়েছে কালে কালে। ডুমুনীর এই অসহায় মৃত্যুই হয়তো সমকালীন সকল মানুষকে আকর্ষণ করেছিল। জনগণ তখন তাকে দেবীর আসনে বসিয়েছিল। কেননা, এই অঞ্চলে 'ডোমর' পদবীধারী অনেক হিন্দু বা মুসলমান আছেন, যাঁরা মা-ডুমুনীর আশীর্বাদপুষ্ট বলে কথিত। সুতরাং ডুমুনী পুজোর মধ্যে মানুষ পুজোর ইতিহাস সংগুপ্ত আছে। অবশ্য সমাজবিজ্ঞানীরা মা-ডুমুনীকে বলবেন ফার্টিলিটি গডেস্ বা উর্বরতাবাদের দেবী। তিনি প্রজননের আধার। যেহেতু উপাসকেরা তাঁর পুজো দেয় বন্ধ্যাত্ব-মোচনে কিংবা সন্তান লাভের জন্যে॥

গ. পুঁড়া : জীবিত জ্যেষ্ঠ সন্তান পুজো

উৎকল থেকে এদেশে এসেছেন যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণেরা। পশ্চিমবাংলার দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্তে তাঁরা বাস করছেন বেশ ক-পুরুষ ধরে। এঁদের কৌলিক পদবী নানা রকম—সিংহচৌধুরী, সিংহবাবু, সিংহমহাপাত্র, সিংহ, মহাপাত্র, পাত্র, সন্নিগ্রহী, সৎপথী, প্রহরাজ, পতি, পাঠক, পণ্ডা, দাশ, দাশ চক্রবর্তী, মিশ্র, পাইন, নায়ক প্রভৃতি। বাঁকুড়া জেলার রাইপুর, খাতড়া, সিমলাপাল, তালডাংরা, রানীবাঁধ থানা, মেদিনীপুর জেলার প্রায় সব মহকুমাতে এবং পুরুলিয়া জেলার কোনো কোনো স্থানে এঁরা বাস করছেন স্বচ্ছন্দে। বেশ মিশে গেছেন এদেশবাসীর জীবনযাপনের সঙ্গে। গ্রহণ বর্জনের মধ্যদিয়ে এঁরা চলেছেন। তবু অনেক কিছুই আছে, যা তাঁরা পালন করছেন সগৌরবে, পূর্বপুরুষের পালিত প্রথাকে এখনো রক্ষা করছেন তেমনি পুরোনো রীতিতেই। তেমনি একটি পুজোব্রত হলো 'পুঁড়া'। সে হলো দম্পতির প্রথম বা জ্যেষ্ঠ সন্তানের আনুষ্ঠানিক পুজো কিংবা আশীর্বাদ সম্মাননা।

উৎকলীয় শব্দ পঢ়ুঁহা। অর্থ প্রথম। পঢ়ুঁহা > পড়ুঁয়া > পুড়াঁ, পুঁড়া। পঢ়ুঁহা > পড়ুঁয়া > পড়োঁ, পঁড়ো। স্বামী স্ত্রী সন্তান মিলিয়ে একটি পরিবার। এই পরিবারের :জ্যেষ্ঠ সন্তান অথবা একটি বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারের প্রতি দম্পতির প্রথম সন্তান, তা ছেলে বা মেয়ে যাই হোক, আনুষ্ঠানিকভাবে তার পুজোই পুঁড়া বা 'পুঁড়াবাসনা'। পুজো করেন প্রধানত মা বা মা-বাবা। তাঁদের অবর্তমানে অন্যান্য গুরুজন বা নিকট আত্মীয়বর্গ। পুজো হয় অঘ্রাণ-মাসের শুক্লা অষ্টমী তিথিতে, পুজো সকাল দিকে। পূজ্য পূজক উভয়েই থাকেন উপবাসে, শুদ্ধাচারে। বেলা গড়িয়ে গেলে খেতে পারেন দুধ চিঁড়ে। পাশাপাশি দুটি কাঠের পিঁড়ি রাখা হয়। একটিতে রাখা হয় পাঁচ বা সাতটি গোবরের নাড়ু। নাড়ুর ওপর দুব্বোঘাস, গাঁদাফুল, ধান যব তিল প্রভৃতি। সন্তানের মামার বাড়ি থেকে আসে 'হলুদছোপানো নতুন কাপড়', উত্তরীয় ও অন্যান্য নানা উপকরণ। সন্তান সেই কাপড় পরে। অপর পিঁড়িতে বসে। মা তার মাথায় দেন ধান দুব্বো ফুল। প্রদীপ ঘুরিয়ে আরতি করেন। নানা কথায় আশীর্বাদ করেন। সন্তানের সামনে রাখা হয় পিঠে-পায়েস, ভাত-তরকারী। প্রায় স্থানেই দেখেছি, এদিন সন্তানকে সাজানো হয় দেব প্রতিমার মতোই, চন্দনে কাজলে ফুলমালা ও অলংকারে। জ্বালা হয় ধূপদীপ। বাজানো হয় শাঁখ ঘণ্টা। দেওয়া হয় উলু। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব ভাটাভিখিরি সব আসে বাড়িতে। যেন পরব লেগে যায়। কোনো কোনো স্থানে সমগ্র অনুষ্ঠানটি হয় নারায়ণশিলার সামনে। নারায়ণশিলার পুজো হয় নান্দীমুখের মতোই। মায়ের পুত্র-পুজোর শেষে অন্যান্য গুরুজনেরাও

সন্তানদের মাথায় দেন ফুল, ধান দূর্বো চন্দনাদি। ইদানিং প্রায় সব স্থানেই রঘুনাথ বা নারায়ণের প্রসাদ ও ফুল দেওয়ার চল হয়েছে।

আগেকার দিনে পীঁড়া হতো ভুজনো বা অন্নপ্রাশনের দিনে বা তার নিকটবর্তী সময়ে। পরে সময়টা পালটানো হয়েছে শিশুর অকালমৃত্যুর জন্যে। এখন পাঁচ থেকে সাত বছরের আগে পীঁড়া হয়না। কারণ একবার এক সন্তানের পীঁড়া হয়ে গেলে, এবং অকস্মাৎ সে মারা গেলে দ্বিতীয় সন্তানের আর পীঁড়া হবে না, তখন অপেক্ষা করতে হবে অষ্টম গর্ভের সন্তানের জন্যে। কিন্তু প্রথম সন্তানের পীঁড়া না-হলে, এবং সে মারা গেলে, দ্বিতীয় সন্তানই প্রথম জীবিত সন্তান বলে পীঁড়া হবে।

পীঁড়া পুজো চলে সন্তানের প্রথম পুজো থেকে প্রতিবছর, যতদিন সে জীবিত থাকবে। একজন বালিকার পিতৃগৃহে পীঁড়া হয়, তারপর যথাসময়ে সে পতি-গৃহে যায়, কিন্তু তার পীঁড়াপুজো থেমে যায় না, সেখানেও সে পূজিত হয়। কিন্তু কোনো নারী যদি বিধবা হয়, তবে সেদিন থেকেই তার পীঁড়া বন্ধ হয়ে যায়। নিকটতম আত্মীয়স্বজন না-থাকলেও পীঁড়া বন্ধ হয় পুরুষদেরও।

সমাজবিজ্ঞানীরা পীঁড়া পুজোকে বলবেন উর্বরতাবাদের নজির। কারণ গোবরনাড়ু, দূর্বোঘাস, ধান তিল যব প্রভৃতি শস্যপ্রদান প্রজননকেই ইঙ্গিত করে। এ পুজোব্রত এদেশের অন্য কোনো সম্প্রদায়ের নেই। তবে এদেশের তুষ তুষলী প্রভৃতি কোনো কোনো ব্রতে গোববনাড়ু, শস্যদানা বা ঘাস গোঁজা হয়।

পশ্চিমবাংলায় সন্তানপুজোর বিধি নেই। আছে জামাই-বাঁধনা ও ভাইফোঁটা। তন্মধ্যে জামাইবাঁধনা বা জামাইষষ্ঠীতে জামাতাকে বাড়িতে এনে যে আপ্যায়ণ করা হয়, তা পুজোরই নামান্তব। তা হলো শাশুড়ি কর্তৃক জামাতার মাথায় ধানদূর্বো দেওয়া। কিন্তু এর ভেতরে আছে কন্যার প্রতি জামাতার আকর্ষণ বৃদ্ধি। জামাইকে সন্তুষ্ট রাখা। যার অন্তর্লীন কথাটি প্রজনন, কন্যার সন্তানলাভ।

কিন্তু ভাইফোঁটা, যাকে বলে ভ্রাতৃবন্দনা বা ভ্রাতৃসম্বর্ধনা, তার মূলে যম-যমীর প্রসঙ্গ সংগুপ্ত থাকলেও, সমাজে ভাই-এর বাড়িতে বোনের আদর প্রতিষ্ঠাই তার মুখ্য ইঙ্গিত। নারীরা বলেন ভাইফোঁটায় যম প্রীত হন, ভাই-এর যমভয় বা মৃত্যুভয় দূর হয়। একসময় মেয়েরা ভাই-এর কল্যাণে 'সন্ধ্যামণি ব্রত' করতো।

একদা এদেশে 'গুরুবাদ' প্রবল হয়েছিল। তখন জীবিত গুরুকে পুজো করার দিন নির্দিষ্ট হয়েছিল আষাঢ়ের পূর্ণিমায়, যাকে বলে গুরুপূর্ণিমা। অর্থাৎ জীবিত মানুষকে পুজো করার বিবিধ রীতিই ছিল এদেশে এক একসময়। সংস্কৃতি বিবর্তনের পথে তার রূপ কিছুটা বদলেছে, কিন্তু সমাজ থেকে তা একেবারেই বিলুপ্ত হয়নি॥

প্রা স ঙ্গি ক গ্র

ডঃ অমলেন্দু মিত্র □ রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর (১৯৭২)
অশোক মিত্র □ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা (৫ খণ্ড)
ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় □ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১-৩)
ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য □ বাংলার লোকশ্রুতি (১৯৬০)
গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু □ বাংলার লৌলিক দেবতা (১৯৭৮)
ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায় □ লোকসংস্কৃতির তত্ত্বরূপ ও স্বরূপ সন্ধান (১৯৮৫)
ডঃ দুলাল চৌধুরী □ বাংলায় লোকউৎসব (১৯৮৭)
ডঃ নির্মল দাশ □ মধ্যযুগের কাব্যপাঠ
ডঃ নীহাররঞ্জন রায় □ বাঙালীর ইতিহাস (আদি ১-২, ১৯৮০)
ডঃ পবিত্র সরকার □ ভাষা দেশ কাল (১৯৮৫)
ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত □ পূজাপার্বণের উৎস কথা (১৯৮৪)
ডঃ বিজিতকুমার দত্ত ও
ডঃ সুনন্দা দত্ত □ মানিকরামের ধর্মমঙ্গল (১৯৬০)
বিনয় ঘোষ □ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (১-২-৩, ১৯৭৬-৭৮-৮০)
ডঃ ভুদেব চৌধুরী □ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (১ম)
ডঃ ময়হারুল ইসলাম □ ফোকলোর চর্চার রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি
ডঃ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি □ পূজাপার্বণ (১৯৮৩)
ডঃ সনৎ মিত্র □ পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি বিচিত্রা (১৯৭৫)
ডঃ সুকুমার সেন □ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১/পূ, অপ)
ডঃ সুধীরকুমার করণ □ সীমান্ত বাংলার লোকযান (১৯৬৬)
A. K. Banerjee □ W. B. District Gazetters
J. G. Frazer □ The Golden Bough (1-12, 1914-20)
L. H. Morgan □ Ancient Society (1949)
L. S.S.O' Malley □ Bengal District Gaxetters
P. K. Bhoumik □ Socio-Cultural Profile of Frontier Bengal
R. Whitehead □ Viilage Gods of South-India (1972)
Suniti Kr. Chatterji □ O. D. B.L. (1-3, 1985)

বিবিধ রচনা ঃ

ডঃ চিত্তরঞ্জন লাহা
ডঃ বিনয়কুমার সরকার
ডঃ সুকুমার বিশ্বাস

বিচিত্র সন্ধান

☐ পূর্বপুরুষ-দেবতা

☐ স্থান নাম